প্রতিধ্বনি।

রাজ সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।
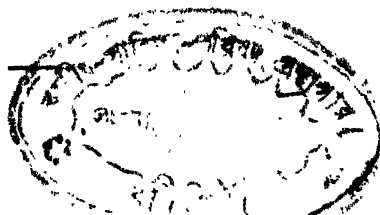
শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	১৬	কল্পনা-রাজ্যে	কল্পনা রাজ্য
৪৫	১৩	তমোগুণাবলম্বী	তমোগুণাবলম্বীর পক্ষে
৪৮	২	তাঁহার	তাঁহাদের
৪৮	৩	তিনি	তাঁহারা
৬১	২০	চিরদিন	[illegible]চিরদীন
৬২	১৯	যাইয়া	[illegible]হিল
৬২	২২	ছুটিত	ছুটয়ে
৬৩	১১	জেগে	জাগে
৬৫	১	যমুনার	যমুনায়
৬৫	৫	উদ্ভ্রান্ত	উদ্ভ্রান্তা
৬৭	২১	তুচ্ছ তাহা	উচ্চ কণ্ঠ
৮০	৪	কৃষ্ণ	নীল
৯৬	১৫	কার্য্য-প্রকৃত	কার্য্য প্রকৃত
১০৩	৫	গ্রহফেরেহলে	গ্রহফেরে হ'লে
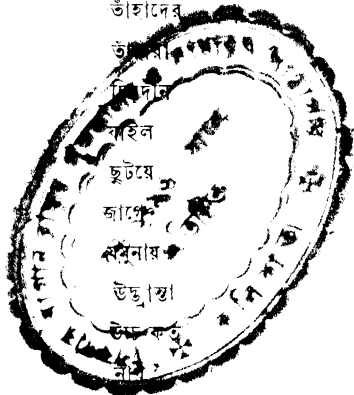
"প্রতিধ্বনি" কার্য্যালয়।

৩১।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

শাখা কার্য্যালয়।

৭৫।১ বিডন্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

PRINTED BY GIRIJANATH MUKHERJI.
GARIBPUR, CHIKITSA-PROKASH PRESS.
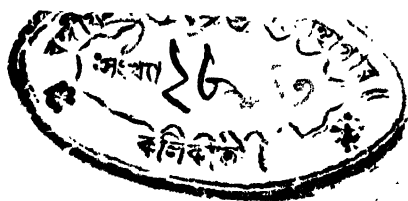
পূর্ব্বাভাষ।

ক্ষুদ্র কলেবর "প্রতিধ্বনি"র একটা পল্লবিত পূর্ব্বাভাষ দিবার কিছুই আবশ্যক নাই ; সুতরাং কেবল "প্রতিধ্বনি" কি ছিল এবং কি হইল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত মাত্র লিপিবদ্ধ হইতেছে।

"প্রতিধ্বনি" হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ; বর্ষাধিক কাল হইতে ইহা কতিপয় কলেজের ছাত্র ও সাহিত্যানুরাগী যুবক কর্তৃক লিখিত ও সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে। "প্রতিধ্বনি" হস্তলিখিত হইলেও ইহার পাঠক সংখ্যা সহস্রের ন্যূন নহে। ইহাতে প্রথম বর্ষে প্রকাশিত যে সমুদয় প্রবন্ধ কবিতাদি উক্ত পাঠকবর্গ কর্তৃক সমধিক প্রশংসিত হইয়াছিল। তন্মধ্য হইতে কতিপয় নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া উক্ত পাঠক ও পরিচালকবর্গের সম্পূর্ণ সাহায্যেই এই বার্ষিক "প্রতিধ্বনি" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ বা কবিতা যে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল প্রবন্ধ কবিতাদির নিম্নে তাহা লেখকগণের নামসহ প্রদত্ত হইল।

এক্ষণে, "প্রতিধ্বনি" নির্ঝরিণীর মধুর কুলু কুলুধ্বনির

ন্যায় সাহিত্যানুরাগী জনগণের শ্রবণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইয়া যদি ইহার তরুণবয়স্ক লেখক ও পরিচালকবৃন্দের জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারে, তবে বুঝিব ইহার প্রচার সার্থক হইয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ ইতি——

কলিকাতা
৩১।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট
১লা চৈত্র—১৩০৫। } শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

———

সূচীপত্র।

প্রতিধ্বনি।

——:o:——

অবতরণিকা।

উজ্জ্বল তারকারাজি-বিরাজিত সাহিত্যগগনে আজ সহসা প্রভাহীনা নীহারিকার উদয় কেন? প্রকাণ্ড মহীরুহ-পরিশোভিত সাহিত্যারণ্যে আজ ক্ষুদ্র পাদপের আকস্মিক অঙ্কুরোদ্গম কেন? ফলপুষ্প-শোভন-বৃহদায়তন-দ্বীপসমন্বিত সাহিত্যার্ণবে ক্ষুদ্র দ্বীপবিশেষের হঠাৎ মস্তকোন্নয়ন কেন? নয়নাভিরাম সুন্দর প্রাসাদশোভিত সাহিত্য-নগরে পর্ণকুটীরের নির্ম্মাণ কেন? আর সাময়িক পত্রিকার বহুল প্রচার সত্ত্বেও আবার "প্রতিধ্বনি"র প্রচার কেন?

প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে আমরা জানিতে পারি যে প্রত্যেক বস্তুরই ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি

উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলি সীমাবদ্ধ নহে। আমরা উক্ত বস্তু সম্বন্ধে যতই জ্ঞান লাভ করি, ততই নূতন নূতন উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যগুলি সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যের ন্যায় জীবের পক্ষে প্রযুজ্য। কিন্তু পরমেশ্বর, বোধ হয়, উহাদের প্রত্যেককে এক একটি উদ্দেশ্য দিয়া সৃজন করিয়াছেন; এবং সেই উদ্দেশ্যের সংসাধনে প্রত্যেককে নিয়ত পরিচালিত করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত মঙ্গল সাধন করিতেছেন। পরমেশ্বর-প্রদত্ত এই উদ্দেশ্যকে আমরা মুখ্য উদ্দেশ্য বলিব এবং আমরা যাহাকে উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি তাহাকে গৌণ উদ্দেশ্য বলিব। দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাকে আরো সহজ করিতে চেষ্টা করা যাউক। অতি প্রাচীনকালে—যখন সভ্যতালোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকারের কণামাত্রও বিতাড়িত হয় নাই—আমরা মনে করিতাম নক্ষত্রেরা রাত্রে যৎকিঞ্চিত আলোকপ্রদান ও আকাশের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে, অতএব রাত্রে আলোক-প্রদান ও আকাশের শোভা-বর্দ্ধনই উহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন অসামান্য বিজ্ঞানবিদ্ স্যার্ আইজাক্ নিউটন (Sir Isaac Newton) মহাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিলেন, তখন আমরা বুঝিলাম এক একটি নক্ষত্র এক একটি সৌর জগতের কেন্দ্রস্থিত এক একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য-বিশেষ, এবং একটি অপরটিকে আকর্ষণ করিয়া আছে; তখন আমরা বুঝিলাম কেবল মাত্র রাত্রে ইহজগতে

আলোক-প্রদান ও আকাশের শোভাবর্দ্ধনই ইহাদের উদ্দেশ্য নহে, তত্রত্য জগন্মণ্ডলীকে আলোক প্রদান ও পরস্পরের স্থান-বিচ্যুতি নিবারণের জন্য পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-প্রয়োগও ইহাদের উদ্দেশ্য। আবার নক্ষত্রবিষয়ে আমাদের জ্ঞান যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই আমরা নব নব উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারিব। এই সকল উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহাদের এক একটি ঈশ্বরপ্রদত্ত উদ্দেশ্য আছে: এবং তাহারই সংসাধনে ইহারা ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ত পরিচালিত হইয়া বিশ্বের মঙ্গলসাধন করিতেছে। ইহাই নক্ষত্রদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুরই এক একটি মুখ্য উদ্দেশ্য আছে।

কোন বস্তুর সত্ত্বার কারণ জানিতে হইলে উক্ত বস্তুর মুখ্য উদ্দেশ্য জানা আবশ্যক; কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞান এতই সীমাবদ্ধ যে মুখ্য উদ্দেশের কথা দূরে থাকুক আমরা কোন বস্তুর গৌণ উদ্দেশ্যসকলও জানিতে পারি না। এই জন্য আমরা কোন বস্তুর উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত নহি। তাই বলি, কেমন করিয়া আমরা সম্যকরূপে বলিতে পারিব যে সাময়িক পত্রিকার বহুল প্রচার সত্ত্বেও আবার "প্রতিধ্বনি"র প্রচার কেন? কোনও মানুষই ইহার উত্তর দিতে পারে না। কেবলমাত্র সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, বিশ্ববিধাতা, অনন্ত জ্ঞানের আধার পরমেশ্বরই বলিতে পারেন "প্রতিধ্বনি"র প্রচার কেন? "প্রতিধ্বনি"র মুখ্য উদ্দেশ্য কি? তিনি

অবশ্যই এতাবৎ অপরিজ্ঞাত কোন জাগতিক মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত আমাদের অন্তঃকরণে "প্রতিধ্বনি"র প্রচারেচ্ছা প্রদান করিয়াছেন।

এস্থলে অনেকে প্রশ্ন করিবেন "প্রতিধ্বনি" আবার জগতের কি মঙ্গল সাধন করিবে, এরূপ প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে হয়ত অনেকে বলিবেন, "ঈশ্বর আবার কি? জগতের সমুদয় কার্য্যকলাপত' প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে।" আবার অপর কেহ হয়ত বলিবেন, "ভাল, ঈশ্বর আছেন স্বীকার করি; কিন্তু তিনি কি আমাদের ইচ্ছাবৃত্তির পরিচালক, যে তিনি আমাদিগকে "প্রতিধ্বনি"র প্রচারেচ্ছা প্রদান করিয়াছেন?" এ সকল লোকের জন্য আপাততঃ আমাদের কোন উত্তর নাই। কিন্তু যাঁহারা কেবলমাত্র ঈশ্বরের সত্ত্বায় বিশ্বাস করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, এমন কি জগতের কোন কার্য্যই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পাদিত হইতেছে না, ইহা যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা যদি জিজ্ঞাসা করেন,—"প্রতিধ্বনি" কি প্রকারে জগতের মঙ্গল সাধন করিবে? তাহা হইলে ইহার উত্তরস্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিতেছি।

জগতের সকল বস্তুই দ্বিভাবাপন্ন। যাহা একের নিকট একভাবাপন্ন তাহা অন্যের নিকট অন্যভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একের নিকট যাহা শীতল, অন্যের নিকট তাহা উষ্ণ; একের পক্ষে যাহা সুখ, অপরের পক্ষে তাহা

দুঃখ ; একের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, অপরের পক্ষে তাহা অমঙ্গলকর ; একের পক্ষে যাহা দুঃখ, অপরের পক্ষে তাহা সুখ ; একের পক্ষে যাহা অমঙ্গলকর, অপরের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর ; কিন্তু একই বস্তু, অবস্থা বা ঘটনা, একই সময়ে বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট হইতে পারে না, অবস্থা বিশেষে ইহাকে বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তবে যিনি সকল অবস্থার অতীত, সেই পরমেশ্বরের নিকট ইহার গুণের বৈলক্ষণ্য থাকে না। ইহা এক গুণ-বিশিষ্ট এবং সেই গুণটীই ইহার নিজগুণ।

মঙ্গলময় পরমেশ্বর সমুদয় দ্রব্যের, অবস্থাবিশেষের ও ঘটনাবলীর নিজগুণ-সকলকে অবশ্যই বিশ্বের মঙ্গলকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। সৃষ্টি-কাল হইতে ইদানীন্তনকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি, পৃথিবী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ; বিশ্ব ক্রমোন্নতিশীল। পূর্ব্বোল্লিখিত নিজগুণ সকল পৃথিবীর মঙ্গলকারী না হইলে পৃথিবীর এ উন্নতি কখনই হইত না। যেহেতু উন্নতিই বিশ্বের মঙ্গল ; এবং দ্রব্যসমূহের, অবস্থাবিশেষের ও ঘটনাবলীর নিজগুণ দ্বারা বিশ্বোন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে।

যদি আমাদের তাদৃশ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আমরা বুঝিতাম যে জগতের যাবতীয় ঘটনা বিশ্ব-হিতার্থে সংঘটিত হইয়া থাকে। ভারতে হিন্দুরাজত্বের অবসান হইল, মুসল-

মান ভারতরাজ্য অধিকার করিল, হিন্দু যার পর নাই মর্ম্মাহত হইল, ইহাতে বিশ্বের কি মঙ্গল হইল? হিন্দুরই বা কি মঙ্গল হইল? বিশ্বের মঙ্গল অবশ্য হইয়াছে, শুধু হিন্দুকে লইয়া বিশ্ব নহে যে, হিন্দুর অমঙ্গলে বিশ্বের অমঙ্গল হইবে; আর হিন্দুরই বা কিসে অমঙ্গল হইল? উক্ত ঘটনা হিন্দুকে —শুদ্ধ হিন্দুকেই বা কেন—সমুদায় বিশ্বকে ভাল করিয়া শিখাইয়া দিল যে গৃহবিবাদ জাতীয় অধঃপতনের মূল: রাজ্য-শাসন অতীব কঠোর কর্ত্তব্যপালন; যে জাতি রাজ্য-শাসন করিবে সেই জাতিকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির যতদূর সম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন পরিস্ফূরণ করিতে হইবে এবং এই কর্ত্তব্যপালনে যে জাতি যে পরিমাণে পরাঙ্মুখ, রাজ্যশাসনে সেই জাতি সেই পরিমাণে অনুপযুক্ত হইবে। হিন্দু অনুপযুক্ত হইয়াছিল তাই হিন্দু উক্ত কার্য্য হইতে অপসৃত হইল। ইহা কি বিশ্বের পক্ষে একটা মহৎশিক্ষা নহে? এবং এই শিক্ষা কি বিশ্বের উন্নতি-বিধায়ক নহে? ইহা কি বিশ্বে ন্যায়ের আধিপত্য প্রমাণ করিতেছে না? যদি আপাততঃকষ্টকর উল্লিখিত ঘটনা হইতে বিশ্বের এতাদৃশ উন্নতি সাধিত হইল, তবে সামান্য "প্রতিধ্বনি"র প্রচার হইতে জগতের কোনও মঙ্গলই বা সাধিত হইবে না কেন?

সাময়িক পত্রিকার প্রচার হইতে দেশের কি কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে আমরা অতঃপর তাহার আলোচনা করিব।

ইহা প্রায় সকল শ্রেণীর লোককে বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত করিয়া রাখে। অনেকে বাল্য বয়সে কিছু বিদ্যো-পার্জ্জন করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং দিবসের পরিশ্রমান্তে তাঁহারা এতদূর ক্লান্তিবোধ করেন, যে তখন আর তাঁহাদের বিদ্যালোচনা আদৌ ভাল লাগে না। যদি তাঁহারা তখন একাধারে চিত্তপ্রসাদ-দায়িনী কবিতা, প্রীতিকর উপন্যাস ও মনোমুগ্ধকর প্রবন্ধের সমাবেশ-সমন্বিত একখানি পুস্তক দেখিতে পান তাহা হইলে তাহা পাঠ করিয়া তাঁহারা শরীরের ক্লান্তি অপনোদন করেন ও পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। সাময়িক পত্রিকা উক্তরূপ একখানি পুস্তিকা। ইহার প্রচলন না থাকিলে সভ্যদেশে সকল শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা এতদূর প্রচলিত থাকিত না।

সাময়িক পত্রিকা শিক্ষিত লোকদিগের মানসিক উদারতা সম্পাদন করিয়া থাকে। শিক্ষিত লোকেরা প্রায় এক বিষয়েরই অধ্যয়নে ও উৎকর্ষসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া অপরা-পর বিষয়ের অধ্যয়নে বিশেষ অবহেলা করিয়া থাকেন। সুতরাং অধীত বিষয়ের জ্ঞানের উৎকর্ষ হইলেও তাঁহাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ রহিয়া যায়। সকল বিষয় কিছু কিছু জানা না থাকিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল কৈ? জ্ঞান প্রশস্ত হইলই বা কৈ? বিশ্রাম সময়ে সাময়িক পত্রিকার অধীতাপর সকল বিষয়ের আলোচনা পাঠ করিয়া ইহারা ঐ সকলে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন ও ক্রমশঃ ইহাদের মনের

সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া যায়। তখন ইঁহারা ঐ সকল বিষয়ের উপকারিতা বুঝিতে পারেন এবং কোন ব্যক্তিকে অধীতাপর কোন বিষয়ের নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত দেখিয়া ঈর্ষা-বশতঃ তাঁহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করা দূরে থাকুক, কিসে আবিষ্কারকারীর সহায়তা হয়, কিসে উক্ত বিষয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহারই চেষ্টা করেন।

সাময়িক পত্রিকা নিম্নলিখিত রূপেও আমাদের মানসিক উদারতাসম্পাদন করিয়া থাকে। স্বভাবস্বার্থপর মানবজাতি আপনাপন কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত; স্বয়ং চেষ্টা করিয়া যে অপরের বিষয় পর্য্যালোচনা করে লোকের এমন অবকাশও নাই, ইচ্ছাও নাই। সাময়িক পত্রিকা এই সমুদয় আলো-চনা করিয়া মনুষ্যের মনে সহানুভূতির বীজ বপন করিয়া দেয়। এইরূপে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

সাময়িক পত্রিকা সমাজসংস্করণের প্রধান সহায়। সমাজে যতগুলি আচারব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে সকল গুলিই যে ভাল, একথা কেহ বলিতে পারেন না। সমাজ-প্রচলিত-কুব্যবহারকে উন্মূলিত করিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে সুব্যবহারের প্রচলন-করণই প্রকৃত সমাজ-সংস্করণ। সমাজ-সংস্কারের পূর্ব্বে কোন ব্যবহারটী ভাল, কোনটী মন্দ ইহা আমাদের ভাল করিয়া জানা উচিত—যুক্তিবলে ইহা জানা যায় বটে—কিন্তু যুক্তি যাহাকে ভাল বলিল, হয়ত তাহা কার্য্যতঃ মন্দ হইতে পারে; অথবা

যাহাকে মন্দ বলিল তাহা হয়ত ভাল হইতে পারে। সাময়িক পত্রিকায় সামাজিক ব্যবহারের ফলাফলের আলোচনা হইতে আমরা কার্য্যতঃ কোন ব্যবহারটী ভাল, কোনটী মন্দ ইহা স্থির করিতে পারি।

সাময়িক পত্রিকা দ্বারা রাজনৈতিক উন্নতি সংঘটিত হইয়া থাকে। রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী অপরাপর নিয়মগুলির ন্যায় একেবারে দোষশূন্য নহে। রাজ্যমধ্যে এমন দুই একটী নিয়ম প্রচলিত থাকে যাহা প্রজাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। সাময়িক পত্রিকায় সেই গুলির আলোচনা হইলে সাধারণের ও রাজার মনে উহাদের অনুপকারিতার বিষয় দৃঢ়সংস্কারাবদ্ধ হইয়া যায়; তখন ভবিষ্যতে উহাদের রহিত হইয়া যাইবার আশা করা যাইতে পারে। ঐরূপ সাধারণের উপকারী কতিপয় নিয়মের আলোচনা হইলে এবং তাহাদের প্রচলনের প্রয়োজন হইলে, সে গুলির ভবিষ্যৎ-প্রচলনের বিশেষ আশা থাকে।

সাময়িক পত্রিকায় রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা যদি উক্ত বিষয়ের উন্নতির একটী কারণস্বরূপই হইল, তবে কোথাও উন্নতি সহজসাধ্য—আবার কোথাও বা বিশেষ আয়াসসাধ্য হয় কেন? তাহার কারণ আছে। যে দেশ স্বাধীন (অর্থাৎ অপর দেশীয় লোকের দ্বারা শাসিত নহে) বা প্রজাতন্ত্র নিয়মে শাসিত, তথায় রাজনৈতিক উন্নতি সহজসাধ্য। কারণ তথায় শাসিতের মতে যাহা উন্নতি, শাসনকর্ত্তার

মতেও তাহাই উন্নতি এবং উভয়েই ঐ উন্নতিসংঘটনে যত্নশীল। তাই, বোধ হয়, ইংলণ্ড, মার্কিণ, ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্যদেশ সমূহ আজ রাজনীতির সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া আছে। আর যে দেশ পরাধীন (অর্থাৎ যাহা অন্য দেশীয় লোকের দ্বারা শাসিত) বা যথায় যথেচ্ছাচার-তন্ত্র প্রচলিত আছে, তথায় শাসনকর্ত্তা ও শাসিতদিগের উদ্দেশ্য অধিকাংশ স্থলে বিভিন্ন ; সুতরাং তথায় রাজনৈতিক উন্নতি বহু-আয়াস-সাধ্য ; কারণ অনেক স্থলে উভয় পক্ষেরই চেষ্টা থাকে না। সেই জন্য প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে—মুসলমান-রাজত্বের শেষ ভাগে—ভারত রাজনীতির নিম্নতন সোপানে নিপতিত ছিল। উন্নতি আয়াসসাধ্য হইলেও উক্তরূপ রাজনৈতিক আলোচনায় কোন বিষয়ে যে উন্নতি হইয়া থাকে, কেবলমাত্র এই ইংরাজরাজত্বে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাময়িক পত্রিকা আমাদের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির পরিস্ফূরণবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। যখন আমাদের মন অবসাদগ্রস্ত হয়, তখন আমরা সাময়িক পত্রিকা হইতে কোন সুন্দর কবিতা বা উপন্যাস পাঠ করিয়া আমাদের চিত্তাবসাদ দূর করিয়া থাকি। এইরূপে আমরা ক্রমে ক্রমে সকল কবিতা বা উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বুঝিতে সক্ষম হইয়া আমাদের চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তির কিছু উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারি।

সাময়িক পত্রিকা, নীতি-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অনেক তত্ত্ব আমাদিগকে শিখাইয়া ঐ সকল বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া দেয়।

সাময়িক পত্রিকা এ সকল মঙ্গল ব্যতীত ভাষার পুষ্টি সাধন ও দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি-সাধন করিয়া থাকে। ভাষা মাত্রেই শৈশবাবস্থায় নিতান্ত অপরিপুষ্ট ও অসম্পূর্ণ থাকে; তখন ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে, ইহাকে সম্পূর্ণাবস্থায় আনয়ন করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক শিক্ষিত, দেশহিতৈষী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। ভাষার প্রথমাবস্থায় ইহাতে ভালরূপে মনোভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দের অভাব থাকে। এই অভাব-মোচনই ভাষার প্রথম পুষ্টিসাধন। দ্বিতীয় পুষ্টিসাধন ভাষার লালিত্য-সম্পাদন। ভাষাকে সাহিত্যোপযোগী করিতে হইলে প্রথমতঃ এই উভয়বিধ উন্নতির আবশ্যক। সাময়িক পত্রিকার প্রচার হইতে আরম্ভ হইলে, সাধারণের প্রতিপত্তি লাভের জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক, অনেক লোক ইহার লেখক হইতে ইচ্ছা করেন। এবং লিখিতে আরম্ভ করিয়া যখন দেখিতে পান যে ভাষায় ভাল রূপে মনোভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দের অভাব আছে, তখন তাঁহারা ঐ অভাব মোচন করিবার জন্য সাহিত্যানুমোদিত নূতন শব্দের প্রচলন করেন। লেখক-দিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় ভাষার লালিত্য-

সম্পাদনও হইয়া থাকে। যখন সাময়িক পত্রিকা এইরূপে ভাষার পুষ্টিসাধন করে, তখন সাহিত্য স্বতঃই ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে।

এখন আমরা সাময়িক পত্রিকা-জনিত একটি প্রধান অমঙ্গলের কথা বলিব। আমরা দেখিতে পাই, একটী সাময়িক পত্রিকা অপরটীকে ইচ্ছা করিয়া অযথা আক্রমণ করিতেছে, আর অপরটী অতি তীব্রভাবে আত্মসমর্থন করিতেছে। ইহা উভয় পত্রিকায় দলাদলির (party spirit) আবির্ভাব করিয়া দেয়। এবং এই দলাদলি কিছু-কাল অদমিত থাকিলে আপনা হইতেই ঈর্ষায় পরিণত হয়। তখন এ পত্রিকার উন্নতি হইতে দেখিলে কিসে উহার অবনতি হইবে, অপর পত্রিকা তাহাই চেষ্টা করিয়া থাকে। পরস্পরের এইরূপ ব্যবহার হইতে কোন্ অমঙ্গল না সংঘটিত হইতে পারে ?

যে সাময়িক পত্রিকা পূর্ব্বোল্লিখিত অমঙ্গল-সাধন করে না এবং যাহা পূর্ব্বোল্লিখিত মঙ্গলগুলি সাধন করিয়া থাকে অথবা তদ্বিষয়ে যত্নবান হয় তাহাই উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা—বাস্তবিকই তাই। এই প্রলোভনময় জগতে চরিত্রগঠন, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ বৃত্তিগুলির সম্যক পরিস্ফূরণ ও পরিচালন যে অতীব দুঃসাধ্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে যাহা উক্ত দুঃসাধ্য-সাধনে আমাদিগকে সহায়তা করিল তাহাকে উচ্চশ্রেণীর

বলিব না কেন? ইহাও সকলে স্বীকার করিবেন যে উপন্যাসের ভাষা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন পুস্তকের ভাষা হইতে বিভিন্ন; আবার বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোনও পুস্তকের ভাষা উক্ত দ্বিবিধ ভাষা হইতে বিভিন্ন। ভাষার সম্যক পুষ্টিসাধন করিতে হইলে ভাষার বিশেষত্বের বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। তাই বলি, যে সকল সাময়িক পত্রিকা সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া ভাষার সম্যক পুষ্টিসাধন করে তাহারা উচ্চশ্রেণীর না হইয়া কি যাহারা কেবল অতিরঞ্জিত ভাষায় লিখিত উপন্যাস ও কবিতাপূর্ণ, তাহারা উচ্চশ্রেণীর হইবে?

ভারতে এখন এইরূপ পত্রিকার বহুল-প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তবে কি আমরা উক্ত শ্রেণীর পত্রিকা প্রচার করিতে সংকল্প করিয়াছি? ইচ্ছা তাহাই বটে, কিন্তু সে প্রকার সামর্থ্য কই? নীহারিকায় নক্ষত্রের তেজঃ-পুঞ্জ কই? ক্ষুদ্র ব-দ্বীপবিশেষে বৃহদ্দ্বীপের বিশালতা কই? ক্ষুদ্র পাদপে প্রকাণ্ড বৃক্ষের অগণন শাখা-প্রশাখা কই? আমাদের ন্যায় অপরিণত ও অজ্ঞান লেখক-বৃন্দের পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিবার জ্ঞান ও শক্তি কই? কিন্তু নীহারিকাও ত নক্ষত্রে পরিণত হয়, ক্ষুদ্র পাদপও ত প্রকাণ্ড মহীরুহের আকার ধারণ করিয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র ব-দ্বীপও ত কালে বৃহদ্দ্বীপ হয়: তবে কি আমাদের "প্রতিধ্বনি"ও কালে উচ্চশ্রেণীর পত্রিকায় পরিণত হইবে? আবার নীহারিকাও

ত উল্কাখণ্ডে পরিণত হয়, ব-দ্বীপও ত সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হয় এবং ক্ষুদ্র পাদপও ত শুষ্ক হইয়া যায়। তবে কি "প্রতিধ্বনির"ও অস্তিত্ব লোপ হইবে? কেমন করিয়া বলিব "প্রতিধ্বনি"র ভবিতব্য কি? উহা ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে। এই তমোরাশি ভেদ করিবার উপযুক্ত দৃষ্টিশক্তি আমাদের নাই। উহা ভবিষ্যনিয়ন্তা পরমেশ্বর দ্বারা পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে। "প্রতিধ্বনি"র ভাবী অদৃষ্ট যাহাই হউক না কেন, উহা যে জগন্মঙ্গলের কারণস্বরূপ হইবে, এই বিশ্বাসেই আমাদের সুখ—এই বিশ্বাসেই আমাদের শান্তি।

প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণে আমরা দেখিতে পাই একটি প্রকাণ্ড দ্রব্য একেবারে উদ্ভূত হয় না। বৃক্ষ হইতে প্রচুর ফললাভ হইবে, এরূপ আশা করিয়াও কৃষককে প্রথমে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়। সর্ব্বত্রই অতীব ক্ষুদ্র বস্তু হইতে বৃহতের উৎপত্তি দেখা যায়। জগতের জীব বলিয়া আমরাও জগতের নিয়মাধীন। তাই উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা প্রচার করিব, এইরূপ আশায় উত্তেজিত হইয়াও আমরা নিম্নশ্রেণীর পত্রিকা প্রচারে সাহসী হইতেছি। আবার কৃষক বীজ বপন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; কিসে বীজ অঙ্কুরিত হইবে, সেই বিষয়েই বিশেষ চেষ্টাবান। আমরাও নিম্নশ্রেণীর পত্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কিসে উহাকে উচ্চশ্রেণীর করিতে পারি, সর্ব্বথা সেইরূপ চেষ্টা করিব। চেষ্টার

অনুরূপ ফললাভ না হয় আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র আক্ষেপ নাই, আমরা বুঝিব এইরূপ ফলই জগতের মঙ্গলজনক, ভিন্নরূপে জগতের অমঙ্গল হইতে পারিত।

তবে, যাও "প্রতিধ্বনি"! উন্নতি-বিধায়ক শব্দতরঙ্গ উত্থিত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র গমন কর! ভারতবাসীর মন জ্ঞানালোকে আলোকিত কর ও তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে যত্নবান হও!! এবং তোমার আদি প্রেরয়িতার উদ্দেশ্য সাধন কর!!! যিনি আমাদের সর্ব্বনিয়ন্তা ও ফলাফলদাতা সেই ভগবচ্চরণ-কমলে তোমাকে অর্পণ করিলাম। তিনিই তোমাকে স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে সর্ব্বদা পরিচালিত করিবেন।

ভাদ্র—১৩০৪। শ্রীশঃ——

দু'টি ফুল।

১

দেবতার কণ্ঠচ্যুত রম্য দু'টি ফুল!
প্রভাত-বাতাসে ভেসে,
এসেছে এ নর-দেশে,
আপন সৌরভে মরি আপনি আকুল,
ভুবনভুলান রূপ জগতে অতুল।

২

নন্দনের পারিজাত কোরক কোমল,
একজাতি ফুল দু'টি,
এক বৃন্তে আছে ফুটি'
হাসিছে মধুর হাসি কোমল অধরে,
সোহাগ ঝরিছে যেন ঝর্ ঝর্ ঝরে।

৩

ঊষার আঁচলে ছাঁকি' বালার্ক-কিরণ.
চাঁদের জোছনা তায়,
মিশায়ে মলয়-বায়,
গড়িলা কি ফুল দু'টি বিধাতা যতনে,
মনে মনে ভাবি রূপ বসি নিরজনে ?

৪

একবৃন্তে দু'টি ফুল মরি কি সুন্দর !
তেজোপূর্ণ বাল-রবি,
আননে স্বর্গের ছবি,
ঊষার সিন্দুর মাথা কোমল কপোল,
নীলোৎপল নেত্র-তারা উজ্জ্বল, তরল !

৫

তিল-ফুল জিনি নাসা. ভুরু ফুল-ধনু !
কালো কালো চুল গুলি,
বাতাসেতে ঢেউ তুলি,

খেলিছে সুন্দর কিবা মাথায় মাথায়,
বাড়ায়ে মাধুরী তার দ্বিগুণ শোভায়।

৬

কনক-বিদ্যুৎ-বিভা ভাতিছে কপালে,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম তায়,
শোভিছে নীহারপ্রায়,—
শত-দল-দলে, শুভ্র সুগোল সুন্দর,
নিরখি' নয়ন-মন মুগ্ধ নিরন্তর।

৭

নাহি সাজ, নাহি সজ্জা, কমনীয়-কায়,
নাহি ভূষা, নাহি বেশ,
তবু যেন অনিমেষ,—
চেয়ে থাকে আঁখি দু'টি ফুল দু'টি পানে,
নিন্দে বিধাতায় কেন পলক নয়ানে?

৮

বসিয়া ফুলের শিশু বকুল তলায়,
ছোট ছোট রাঙ্গা হাতে,
ফুল তুলি পরে মাথে,
খেলার ঠাকুর পূজে কভু ফুলদলে,
কভু হাসে, কভু নাচে, মাতি কুতূহলে।

৯

আলোকরা ফুল দু'টি আদরের ধন!

আলো করি' খেলাঘর,
খেলা করে নিরন্তর,
হেরিলে উথলে মম স্নেহ পারাবার,
ভেসে যায়—ডুবে যায়—হৃদয়-আগার।

১০

'জ' বলিতে বলে 'দল্', 'চ' বলিতে 'চল্',
হাসে উচ্চে খল্ খল্,
বলে "বা—নয়কি 'দল্' ?"
বুঝিয়া আপন ভুল, কখনো আবার—
—এক, দুই, সাত, বার গণে বার বার।

১১

কখনো উভয়ে মিলি ঝাঁপিয়ে চঞ্চল,
একেবারে কোলে এসে,
সুখ-নীরে ভেসে ভেসে,
রাজত্ব লইয়া বসে হাসিতে হাসিতে,
থাকি কি তখন আর এ পাপ-মহীতে ?

১২

ছার মানুষের দেশ ত্যজিয়া হেলায়,
চলে যাই অতি দূরে,
অতি উচ্চে দেব-পুরে,
শচি-পতি বিরাজেন যে রম্য-নন্দনে,
ফুলের নেশায় মাতি শচী-সতী-সনে।

১৩

'এফুলে' 'সেফুলে' তুলি' তুলনায় তুলে,
'সেফুলে' ঠেলিয়া দূরে,
'এফুলে' সোহাগ-ভরে,
কত চুমা খাই মুখে, কপোলে, মাথায়,
সংসারের শোক-তাপ ভুলি সমুদায়

১৪

নিরখি' তা' দূর হতে কে যেন আবার,
সে সুখের ভাগ নিতে,
ধেয়ে আসি ফুল্ল-চিতে,
কেড়ে লয় ভাগ তার মধুর-চুম্বনে,
হাসে ফুল খল্ খল্ আপনার মনে।

১৫

আবার তখনি—
মনে লয় এই ত সে ত্রিদিব, নন্দন,
এখানেও দেব-শোভা,
এখানেও মনোলোভা—
—ফুটে আছে আলো করি রূপে দশ দিশ,
আলোকরা পারিজাত শিরীশ, যোগীশ।

বৈশাখ—১৩০৫ শ্রীতারিণীচরণ সেন।

ডুমুর-ফুল ।

ডুমুর-ফুলের নাম শুনিয়া হয়ত অনেকেই চমকাইয়া উঠিয়াছেন। চমকাইবারই কথা বটে; অনেকেরই ধারণা আছে যে ডুমুরের ফুল হয় না বা ফুল দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য বহুদিন অন্তর কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে—'তুমি যে একেবারে ডুমুর-ফুল হ'লে' বলিয়া আমরা তাঁহার সহিত রহস্যালাপ করিয়া থাকি। আমাদের দেশে ডুমুর-ফুল দেখিলে রাজা হয়—এ প্রবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। এ প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া যদি কেহ ডুমুর-ফুল দেখিতে পান, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি রাজা হইয়া আমাকে তাঁহার মন্ত্রিত্ব-পদে বরণ করিতে ভুলিবেন না। এখন পাঠকের কপাল, আর আমার হাত যশ।

এই সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীতে অনেক প্রকারের পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়। জুঁই, জবা, চামেলি, গোলাপ প্রভৃতি এক শ্রেণীর পুষ্প। ইহাদের সকলেরই একটী করিয়া বৃন্ত আছে। এই বৃন্তটীর উপরিভাগ কথঞ্চিৎ স্থূল (receptaculum)। এই স্থূল অংশের উপর চারিটী বা পাঁচটী করিয়া নানা-বর্ণের পত্র ক্রমান্বয়ে গোলাকারে সন্নিবেশিত। বহির্ভাগের পত্র-শ্রেণী (calyx) প্রায় হরিৎ বর্ণের হইয়া থাকে। ইহাদের আকার অন্যান্য পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

এই পত্র-শ্রেণীর মধ্যে আর এক শ্রেণীর রঞ্জিত বৃহৎ পত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে পুষ্পের দল (petals) বলা হইয়া থাকে। মধ্যস্থলে পুষ্পের গর্ভকোষ (ovary) বা পুংকেশর অথবা উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পুষ্প-দল কখন কখন নিম্নভাগে মিলিত হইয়া নলাকার ধারণ করে। এক একটী পুষ্প এক একটী রঞ্জিত পত্র-গুচ্ছ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পুষ্প-বৃন্তের (গাঁদা, স্থলপদ্ম ইত্যাদি) উপরিভাগ সমধিক স্থূল ও প্রশস্ত হইয়া থাকে। তখন ইহা দেখিতে একখানি ক্ষুদ্র চাকার ন্যায় : এই চাকার উপরি-ভাগে অনেকগুলি উপরোক্ত পত্রগুচ্ছ বা পুষ্প গোলাকারে সন্নিবেশিত। এই প্রকার পুষ্প হইতেও ফল হয়। ডুমুর-ফুলও প্রায় এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ডুমুর ফুলের স্থূল-বৃন্তভাগ (capitulum) ক্রমশঃ গোলা-কারে বর্দ্ধিত হইয়া (receptaculum) ফাঁপা বর্ত্তুলের ন্যায় আকার ধারণ করে। ইহার ভিতরেও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়। খুব কচি ডুমুর কাটিলে ভিতরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় বস্তু দেখিতে পাই। এই গুলিই ডুমুরের ফুল। অণুবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের পুষ্প-ভাগ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রী-পুষ্পসকল নীচে এবং পুংপুষ্প-সকল উপরে সজ্জিত থাকে। যথা সময়ে পুং-বীজ স্ত্রীপুষ্প-গর্ভে পতিত হইলে উহারা ফল-রূপে পরিণত হয়। অতএব

দেখা যাইতেছে যে ডুমুরের খোলা, বর্দ্ধিত স্থূল-বৃন্তাংশ (receptaculum) ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর ভিতরের যে গুলিকে আমরা বীজ মনে করি তাহারাই এক একটী ফল।
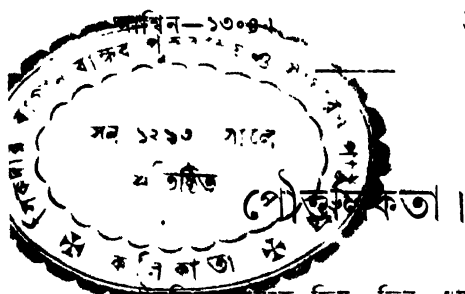
আশ্বিন—১৩০৪। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দে।

পৌত্তলিকতা।

পৌত্তলিকতাসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বহুবিধ অযথা নিন্দাবাক্য শুনিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ তাঁহাদের তর্ক এই যে, যিনি নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ, জ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, একটি কুৎসিত বিকট আকার মূর্ত্তিকে পূজা করিলে তাঁহার পূজা কিরূপে হইতে পারে? পরমেশ্বরের মূর্ত্তিজ্ঞানে কোনও প্রতিমা পূজা করিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়: কারণ অসীম ক্ষমতাশালী দয়ার সাগর সেই ঈশ্বরকে সামান্য মৃত্তিকা বা প্রস্তরগঠিত বলা হয়।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও ধ্বংসকর্ত্তা। তিনি অতিশয় মহৎ, তিনি আমাদের জ্ঞানের অতীত, বুদ্ধির অতীত এবং সকল ইন্দ্রিয়েরও অতীত। আমরা তাঁহাকে

কখন দেখিতে পাই না, কিন্তু কেবল তাঁহার কার্য্য-সমস্ত দেখিতে পাই। অতএব তাঁহার হস্তপদাদি অবয়ব আছে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কেবল তিনি যে কার্য্যক্ষম তাহাই বুঝিতে পারি। আমরা কখন কোন ব্যক্তিকে চিনিতে হইলে প্রথমে তাহার শরীরের, পরে তাহার সকল গুণের পরিচয় দিয়া থাকি। তৎপরে সেই সমস্ত চিন্তা করিয়া মনে মনে একটি আকৃতি ধারণা করিতে পারি। ঈশ্বরের বিষয়েও আমরা এই নিয়মটি সন্নিবেশিত করিতে যাই; কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখন দেখি নাই, অতএব আমাদের যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, আকৃতি দিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি, এবং সেই বর্ণনানুরূপ ধ্যান করিয়া থাকি।

প্রতিমা পূজা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয় একথা একান্ত অসঙ্গত। মনে করুন এক বালক জন্মাবধি তাহার জননীকে দেখে নাই। কিন্তু সে সকলের নিকটেই শিক্ষা করে যে মাতৃভক্তি শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম। তাহার মনে মাতৃভক্তির উদয় হইল এবং তখন সে স্ব-ইচ্ছায় একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে মাতৃজ্ঞানে সাতিশয় ভক্তি সহকারে পূজা করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে তাহার বিদেশবাসিনী মাতা গৃহে আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পুত্র মাতৃজ্ঞানে একটি অতি কুৎসিত প্রতিমাকে পূজা করিতেছে। তখন তিনি কি মনে করিবেন? তিনি কি পুত্রের ভক্তি ও স্নেহ

দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন না? তিনি কি পুত্রকে সুপুত্র বলিয়া সাদরে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন না? তিনি কি শতবার সেই সুপুত্রের মুখচুম্বন করিবেন না? না তিনি তখন রাগান্বিত হইয়া বলিবেন যে,—"আমার এমন সুন্দর রূপ আছে আর তুমি এই কুৎসিত মূর্ত্তিকে আমার সমতুল বোধ করিয়া পূজা করিতেছ?" তাহার মাতা যে পুত্রকে শতবার ধন্যবাদ দিতেছেন: কিসের জন্য? তাহার সেই উপাস্য মূর্ত্তির জন্য কি তাহার সুদৃঢ় ভক্তির জন্য? মূর্ত্তিতে কিছু আসিয়া যায় না; ভক্তি ও প্রেমই প্রকৃত উপাসনার অঙ্গ।

ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেন তাহা হইলে কি তিনি সাকার হইতে পারেন না? তাহাই যদি না পারিলেন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেন কি প্রকারে? ইহা অতি হাস্যাস্পদ কথা যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ তিনি সাকার হইতে পারেন না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সকল স্থলেই বিদ্যমান আছেন, অথচ পৌত্তলিকদিগের মন্দিরে তাহাদের উপাস্য প্রতিমার মধ্যে নাই; ইহা কি সম্ভব? ইহাও অতি হাস্যাস্পদ কথা যে যিনি জ্ঞানময় চৈতন্য-স্বরূপ তিনি পৌত্তলিকদিগের জ্ঞানের মধ্যে নাই। কেহ কি বলিতে পারেন যে ঈশ্বর কোন বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কখন অন্যরূপ গ্রহণ করেন নাই। কোন হিন্দু যদি আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

আমাদের দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং আমি যদি তাঁহার কথায় প্রত্যয় না করি, তাহা হইলে তাঁহার সহস্র চেষ্টা বিফল হইবে। সেইরূপ যদি কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে যিশুখ্রীষ্ট পাপীদিগের উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার শত চেষ্টা যদি আমি মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে কেহই আমাকে বিশ্বাস করাইতে পারিবেন না। ধর্ম্ম-মাত্রেরই মধ্যে কিছু গূঢ় তত্ত্ব আছে উহা সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাপেক্ষতাচরণ না করিলে জানিতে পারা যায় না। উপাসনা প্রায় সকল জাতির মধ্যেই আছে। এখনও এরূপ এক এক জাতি দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বোলতা, সর্প প্রভৃতি পূজা করে: উক্ত জাতি-সকল ঐ সকল জন্তু পতঙ্গাদিকে ভক্তির চক্ষে দেখে।

ঈশ্বর এই নামটী উচ্চারিত হইলেই লোকের মনে একটু পবিত্র ভাবের উদয় হয়। এরূপ ত কখন দেখা যায় নাই যে সাধারণতঃ ঈশ্বরের নাম শুনিলেই কেহ গালাগালি দিতে আরম্ভ করে। অতঃপর "ঈশ্বর কি?"—এই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বুঝা গেল যে তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি। আমাদের মনে হইল যে হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট মানুষই কেবল ইচ্ছানুরূপ বস্তু প্রস্তুত করিতে পারে: তখন আমরা হস্তপদাদি-বিশিষ্ট আকৃতি প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিলাম। "ঈশ্বর নিরাকার"—ইহ কেহ

কি সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন? না। সেই জন্য প্রাচীন জ্ঞানবান মহাত্মাগণ প্রতিমার মধ্যে ঈশ্বরের নিরাকার ও অনন্তমূর্ত্তি একত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি নীল বর্ণ কেন? অন্য প্রকার বর্ণ তখন কি ছিল না? মহর্ষিগণ আকাশকে অনন্ত স্থির করিয়াছেন ও ইহার বর্ণও নীল অতএব অনন্ত দেবের মূর্ত্তিও নীল হইল। এইরূপ প্রতিমানির্ম্মাণ করিতে মহর্ষিগণ অতিশয় বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। মূর্ত্তি অতি কুৎসিত হইলেও তন্মধ্যে যে কিছু গভীর অর্থ আছে তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু অনেকেই তাহা না জানিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করেন; ঈশ্বরকে যে কেহ বিকটাকার মানব বা মানবী বলিয়া স্থির করেন নাই সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণের যাঁহার যত টুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছিল, তিনি তত টুকুর পূ॰ পরিচয় তাঁহার ইষ্টদেব প্রতিমায় দিয়া গিয়াছেন।

একেবারেই নিরাকার ঈশ্বর ভজনা অসম্ভব বোধে সেই মহা নিরাকার মূর্ত্তিকে সাকার জ্ঞানে পূজার বিধান আছে। তৎপরে এই প্রস্তর বা মৃত্তিকা মূর্ত্তি-জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অবস্থা যখন কেহ প্রাপ্ত হন তখন আর তাঁহার প্রতিমা-পূজার আবশ্যক হয় না। তখন তিনি সেই পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতে সক্ষম হন। ইহারাই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী : কিন্তু সেরূপ ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প।

এতদ্ব্যতিত ঈশ্বরের মনুষ্যের ন্যায় ইতর বৃত্তি নাই যে তিনি, কুৎসিত বলিলে কোপান্বিত কিম্বা সুন্দর বলিলে আনন্দিত হইবেন। তিনি নির্ব্বিকার—তাঁহার পক্ষে ভাল মন্দ কিছুই নাই। ঈশ্বরের উপাসনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না, কিন্তু উপাসকের মনের উন্নতি বিধান হয়।

পৃথিবীতে সাধারণতঃ তিন প্রকারের লোক আছেন। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের কার্য্যের দ্বারা কেবল তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহার বিশেষ গুণ-নিচয় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ তাঁহার গুণ-সমূহ লইয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার সেই বিরাট-মূর্ত্তি দেখিতে চেষ্টা করেন; এবং তৃতীয়শ্রেণীর ব্যক্তিগণ উক্ত দুইটী অবস্থা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মময় জগৎ দেখেন। এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণই পৌত্তলিকতা প্রভৃতি লইয়া অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা বুঝেন না যে প্রতিমা-পূজার উদ্দেশ্য কি এবং কেনই বা লোকে প্রতিমা-পূজা করে।

কার্ত্তিক—১৩০৪। শ্রীগগন-চন্দ্র মিত্র।

কবির প্রাণ।

কি দিয়া, কোথায় বসি, কেবা তুমি মতিমান,
কি কাজ সাধিতে বিশ্বে সৃজিলা কবির প্রাণ!
কেনই বা কোমলতা এতই ঢালিলে তায়?
কি যেন সে প্রেম-ময় সদা স্বপনের প্রায়;
সংসার চাহে না তা'রে সে ত তবু তা'রে চায়,
তা'র সুখ দুঃখে কেন আপনারে ভুলে যায়:
চাহে সে যাহারে হৃদে দিতে স্থান আদরেতে,
চরণে দলিয়া সেই চলে যায় আনন্দেতে;
তবু সাধ—তবু আশা—তবু তারে আত্মজ্ঞান;
কেন এত আকিঞ্চন নাহি যদি প্রতিদান!
বুঝেনা সে কথা কবি, চাহেনা বুঝা'তে কা'রে,
আপনার ভাবে আরো ভুলে যায় আপনারে;
তিরস্কার, পুরস্কার, মান কিংবা অপমান,
কিছুতেই বিচলিত না হয় কবির প্রাণ;
শত পরীক্ষায় কিম্বা সাধনা বা প্রলোভনে,
অণুমাত্র ভাবান্তর না হয় কবির মনে;
অত্যাচার, অবিচার, দারিদ্রের নিষ্পেষণ,
শোকতাপ, লাভালাভ তার কাছে অকারণ;
ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যথা দিব্য সৌন্দর্য্যের ছবি,
নীরবে নির্লিপ্তভাবে ভাবে শুধু তাই কবি;

কি ভাবে বিভোর হ'য়ে গাহে কি মধুর গান—
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তাহে উঠে কি কোমল তান !
তালে তালে মানবের হৃদয় প্লাবিয়া ছুটে,
ভূত ভাবী বর্ত্তমান কত চিন্তা ক্রমে ফুটে ;
যেখানে আঁধার থাকে আলোক প্রবেশে তথা,
বিষাদের সনে যেন পড়ে মনে কোন্ কথা ;
ব'য়ে যায় মরু-হৃদে শান্তির সুধার ধারা,
দুর্ভার জীবন, জ্ঞান হয় রে অমিয়-পারা ;
তবু কবি পরিত্যক্ত মানব-হৃদয়-রাজ্যে,
শত দোষে দোষী হায় প্রতিক্ষণ, প্রতিকার্য্যে !
কিন্তু প্রভো ! এই বিধি—মর্ত্ত্যে হ'ল স্থান তা'র,
কবির উচিত বাস হ'ল নাকি স্বর্গে আর !
বুঝিয়াছি লীলাময় কি উদ্দেশ্য আছে তব,
মর্ত্ত্যে কবি-অবতার রক্ষিতে তোমারি ভব ;
নামমাত্র সংসারেতে থাকে সে কার্য্যের ভরে,
বিশাল কল্পনা-রাজ্যে দেছ প্রতি কবিবরে ;
কিবা স্বর্গ—কিবা মর্ত্ত্য—কেহ নহে তুল্য তা'র,
অবিনাশী সুখরাশি—সে রাজ্যের অধিকার :
বল তবে বল বল যথা অভিরুচি যা'র,
কবির প্রাণের আজ ঘুচেছে ভ্রান্তির ভার !

ফাল্গুন—১৩০৪। শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

বিশ্ব—অনন্ত ও ক্রমোন্নতিশীল।

সৃষ্টির পর পৃথিবী অধিবাসীবৃন্দে পরিপূর্ণ হইলে, যখন তাহারা তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ-বালার্ক-কিরণ-শোভিত পৃথিবীর কমনীয় কান্তি প্রথম পরিদর্শন করিয়াছিল, তখন তাহারা নিশ্চয়ই বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে ও পুলক-পলকহীন-নেত্রে বালার্ক-প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াছিল! আবার যখন তাহারা কৌমুদী-বসনা নিশিতে বিমুগ্ধ-চিত্তে নভোমণ্ডলপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, তখন তাহারা দেখিয়াছিল যে, আকাশ চারিদিকে ঘোর-নীলিমা-পরিব্যাপ্ত,—যে দিকে চক্ষু ফিরান যায় সেই দিকেই উজ্জ্বল-চন্দ্র-কর-সমুদ্ভাসিত-অনন্ত-নীলিমা ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই—এবং তারকাপরিবৃত নিশানাথ সুবৃহৎ-নীল-হ্রদোপরি-ভাসমান অসংখ্য-কুমুদিনী-পরিবৃত বৃহৎ জল-কুসুমবৎ তাহার একদেশে বিরাজমান। দিবাবসানে নিশা ও নিশাবসানে দিবা সমাগত হইয়াছিল, তথাচ তাহাদের দৃষ্টির বিরাম ছিল না; তাহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত-বদনে ও উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত-নয়নে সমভাবে আকাশপ্রতি চাহিয়াছিল ও দেখিয়াছিল—পূর্ব্বাকাশানুরঞ্জক নয়নমনবিমোহন সূর্য্যদেবই মধ্যাহ্নকালে প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে আতপ-তাপে নিদারুণ নিপীড়িত করিয়া, এখনকার মত বিদায় লইতে হইবে ইহা ভাবিয়াই যেন, সন্ধ্যাকালে প্রশান্তমূর্ত্তি

ধারণ করিয়াছিলেন ও আবার তাহাদের নয়ন পরিতৃপ্ত করিয়া স্মিতাননে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে অস্তাচলশায়ী হইয়াছিলেন—অমনি সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রদেব নিজপত্নী তারকা-দল-পরিবৃত হইয়া হাসিতে হাসিতে দৃষ্টিপথের পথিক হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি নিঃসঙ্কোচে আমোদ করিতে পান নাই; সর্ব্বদাই তাঁহাকে সূর্য্যভয়ে সশঙ্কিতচিত্তে প্রেয়সীগণ-সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, এবং নিশাবসানে ভাস্করকে উদিতপ্রায় দেখিয়া স্বভাব-লজ্জাশীলা চন্দ্রপ্রিয়াগণ যখন এককালে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, তখন অনন্যোপায় হইয়া, লাজ-মলিন-বদনে তাঁহাকে ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে হইয়াছিল। কুমুদিনীবল্লভ বড়ই লজ্জাশীল; দিবাকরকে নিকটস্থ হইতে দেখিলেই তিনি মরমে মরিয়া যান; আর তাঁহার উপভোগেচ্ছা বলবতী থাকে না; তাঁহার বদন-মণ্ডল গাঢ়-কালিমাচ্ছন্ন হইয়া যায়; সূর্য্যদেব যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন, বদন-মণ্ডলস্থ কালিমা ততই বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে, এবং এইরূপে যে দিন তিনি রবিহস্তে নিপতিত হন, সেই দিন তাঁহার সমস্ত বদন-মণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন হইয়া যায়; আবার তপনদেব যতই দূরবর্ত্তী হইতে থাকেন, ততই তাঁহার বদন-মণ্ডলে আনন্দ-রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে; এবং এইরূপে যেদিন সূর্য্যদেব সমধিক দূরবর্ত্তী হন, সেই দিন তিনি পূর্ণ-বিকশিত-বদনে নিঃসঙ্কোচে

নক্ষত্র-নিকর-সহ সমস্ত রাত্রি পূর্ণানন্দ ভোগ করেন। ইহাও তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল! ক্রমে যখন তাহাদের বিস্ময়াপনোদন হইল, যখন তাহারা এইরূপ ব্যাপার প্রত্যহই অবলোকন করিতে লাগিল, তখন তাহারা মানব-স্বভাব-সুলভ অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া স্বতঃ প্রশ্ন করিয়াছিল 'এই জ্যোতিষ্মান পদার্থনিচয় কি?'

হায়! তখন তাহারা এই দুরূহ প্রশ্নের সুমীমাংসায় উপনীত হইবে কিসে? তখন মানব-মনে পরিদর্শন-জাত-জ্ঞান-সঞ্চার হয় নাই, পর্য্যবেক্ষণোপযোগী যন্ত্রও ছিল না। তখন ছিল কেবল মনুষ্য আর মনুষ্য-কপোল-কল্পিত-কল্পনা! সেই কল্পনা-বলেই তাহারা সচেষ্ট ও জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা প্রভৃতিতে দেবত্বের আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই!

বড় শুভক্ষণেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন মানব-মনে উদিত হইয়াছিল। ইহার সমাধানেচ্ছাই আজ পর্য্যন্ত নানাদেশীয় জ্যোতিষীদিগকে অনুক্ষণ জ্যোতিষ্ক-পরিদর্শনে নিযুক্ত রাখিয়াছে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত উহার সম্পূর্ণ সমাধান হইল না! কবে যে হইবে তাহা জ্যোতিষ্ক-স্রষ্টা ভিন্ন আর কে বলিতে পারে?

এই পরিদৃশ্যমান জগতে যদি কিছুর আসুরিক ক্ষমতা থাকে, তাহা বিজ্ঞানের। বিজ্ঞান বলে কত যে অসাধ্য সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

বিজ্ঞানই কামানের সৃষ্টি করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত লোকের প্রাণসংহার করিতেছে; বাস্পীয়-শকটের সৃষ্টি করিয়া তিন চারি মাসের পথ তিন চারি দিনে অতিক্রম করিয়া মনুষ্যকে লইয়া যাইতেছে; বাস্পীয় পোতের সৃষ্টি করিয়া দুর্গম সমুদ্রবক্ষকে অনায়াসগম্য করিয়া তুলিয়াছে! আরও যে কত কি করিয়াছে একমুখে তাহার বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। এই বিজ্ঞানই আবার জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীকে দেবতাবোধে প্রাচীনকালের অধিবাসীরা যাহাদের নিকট মস্তক অবনত করিত, সেই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীকে- বৈজ্ঞানিকদিগের ক্রীড়নক করিয়া তুলিয়াছে!

ধন্য বিজ্ঞান! এ জগতে তোমার ক্ষমতা অসীম! কে না অবনত মস্তকে তোমার আদেশ পালন করিয়া থাকে! যদিও তুমি পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সুসমাধান করিতে পার নাই, তথাচ তুমি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য তত্ত্বের প্রচার করিয়াছ। আমাদের প্রবন্ধের সহিত তোমার প্রচারিত যে সকল তত্ত্বের সংস্রব আছে, এখন আমরা সংক্ষেপতঃ তাহাদের আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে মনুষ্য মনে করিত, এবং এখনও অনেক অবৈজ্ঞানিক লোক মনে করে, নভোমণ্ডলস্থ নীলিমাই বোধ হয় আকাশের শেষ সীমা এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তাহার উপরে বিচরণ করিয়া থাকে; বোধ হয় আমাদের এই পৃথিবী ও নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় পরি-

দৃশ্যমান জ্যোতিষ্ক লইয়াই জগৎ,—তাহাদের লইয়াই বিশ্ব; তাহারাই বোধ হয় ঈশ্বরের শিল্পনৈপুণ্যের একমাত্র পরিচায়ক;—তাঁহার সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য বোধ হয় আর কোনও জড়জগতের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন, তখন সকলে দেখিল যে দূরবীক্ষণ সাহায্যে আরও অনেক এতাবৎ অপরিজ্ঞাত জ্যোতিষ্ক দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া থাকে, এইরূপে তাহারা যতই যন্ত্রের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল, ততই প্রত্যক্ষীভূত জ্যোতিষ্কের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ পরিদর্শনের পর বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিলেন যে, নীলিমা আকাশের সীমা নহে, এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সকলে সমদূরবর্ত্তী নহে। অধিক দূরে আছে বলিয়া সমদূরবর্ত্তী না হইলেও তাহাদিগকে সমদূরবর্ত্তী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে জ্যোতিষ্কগুলিকে আমরা সাধারণচক্ষে দেখিতে পাই না, অথচ দূরবীক্ষণ-সাহায্যে বেশ স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই, সেগুলি সাধারণচক্ষে দর্শনীয় সমধিকদূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক হইতে ক্রমশঃ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত দূরবীক্ষণ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ সাহায্যে আবার যেগুলি বেশীর ভাগ দেখিতে পাই সে গুলি আবার আরও দূরে অবস্থিত। এইরূপে ক্রমশঃ গণনা করিয়া যাইলে অবশেষে আমরা অপরিমেয় দূরত্বে আসিয়া পড়ি! সে দূরত্ব প্রত্যক্ষের বহির্ভূত—অনুমানের বহির্ভূত—জ্ঞানের

বহির্ভূত! প্রত্যক্ষের বহির্ভূত হইলেও ইহাই আবার প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভূত। এই অননুমেয় দূরত্বকে আমরা ভাষায় অনন্ত দূরত্ব বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি। এখন আমরা বৈজ্ঞানিক প্রমান-বলে বেশ বুঝিয়াছি বিশ্ব সীমাবদ্ধ নহে, সাধারণচক্ষে পরিদৃশ্যমান জগৎ লইয়া বিশ্ব নহে; বিশ্ব অসীম—অনন্ত! অনাদি ও অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টিনৈপুণ্যের অনন্ত পরিচায়ক! পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের এইরূপ ধারণা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রত্যক্ষানুভাব দ্বারা এরূপ ধারণায় উপনীত হন নাই।

বিশ্ব অনন্ত, জ্যোতিষ্ক অনন্ত, কেবলমাত্র ইহা বলিলে জ্যোতিষ্ক কি? বিশ্ব কি লইয়া?—এই প্রশ্ন-দ্বয়ের সম্যক উত্তর দেওয়া হয় না। এই প্রশ্ন-যুগলের উত্তর দিতে হইলে কয়েক প্রকারের জ্যোতিষ্ক লইয়া বিশ্ব সংগঠিত তাহা বলিতে হইবে।

সাধারণ চক্ষে ও দূরবীক্ষণ সাহায্যে আমরা ছয় প্রকারের জ্যোতিষ্ক দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি:— (১) সূর্য্য, (২) চন্দ্র, (৩) তারকা, (৪) গ্রহ, (৫) নীহারিকা ও (৬) ধুমকেতু। যে কোনও জ্যোতিষ্ক নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা এই ছয় প্রকারের মধ্যে কোন না কোন এক প্রকারের।

সূর্য্য ও তারকা বা নক্ষত্রনিচয় একই প্রকারের পদার্থ। ইহারা উত্তপ্ত জড়পিণ্ড ও স্বতঃ জ্যোতিষ্মান। বিভাকর ও

নক্ষত্রনিচয় আমাদের পৃথিবীর ন্যায় কঠিন নহে। উহাদের পরমাণুনিকর আমাদের পৃথিবীর পরমাণুর ন্যায় এতাদৃশ দৃঢ়সংবদ্ধ নহে। প্রত্যেক পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান আছে। উক্ত পরমাণুনিচয় পারস্পরিক আকর্ষণ-প্রভাবে সংঘর্ষিত হইয়া ভয়ানক উত্তাপের উৎপাদন করে। নক্ষত্র ও সূর্য্যে আমরা যে আলোক দেখিতে পাই তাহা এই উত্তাপসম্ভূত আলোক। উক্ত উত্তাপ ব্যতীত তপন ও নক্ষত্রালোকের আরও একটী কারণ আছে। সূর্য্য ও তারকাসমূহের উপরিভাগ বাষ্পীয় ধাতবাবরণে আবৃত। ঐ সকল ধাতব বাষ্পের সংমিশ্রণেও আলোক উদ্ভূত হইয়া থাকে। নক্ষত্রালোকের চঞ্চল প্রকৃতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে নক্ষত্রেরা স্বতঃ জ্যোতিষ্মান। সূর্য্য স্বতঃ জ্যোতিষ্মান তাহা বোধ হয় প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।

বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিলে গগন-মণ্ডলস্থিত কতকগুলি জ্যোতিষ্কের প্রকৃতি তারকাদিগের প্রকৃতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা-দের আলোক স্থির-প্রকৃতি ও তীব্রতা-বিবর্জ্জিত। তারকা-দিগের হইতে ইহাদের গতি বিভিন্ন। তারকাদিগের বাস্তবিক নিজের কোনও গতি নাই। অথবা থাকিলেও উহারা বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগকে গতিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। উহারা গগনমণ্ডলের সর্ব্বদাই এক-স্থানে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে রাত্রে যে উহাদিগকে

গতিশীল বলিয়া বোধ হয়, তাহা পৃথিবীর গতি-জনিত ভ্রম মাত্র। জ্যোতির্ব্বেত্তারা পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন প্রকৃতিশালী জ্যোতিষ্ক-দিগকে গ্রহ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। উহারা স্বতঃ জ্যোতি-ষ্মান নহে। সূর্য্য-প্রতিফলিত-আলোকে উহাদিগকে জ্যোতি-ষ্মান বলিয়া বোধ হয়। ইহারা পৃথিবীর ন্যায় কঠিন এবং পৃথিবীর ন্যায় রবির চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর সহিত ইহাদের অনেক প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে।

চন্দ্র দেখিতে এত বৃহৎ এবং এতাদৃশ রমনীয় হইলেও ইহা গ্রহদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতীয় জ্যোতিষ্ক। চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় কঠিন ও সূর্য্য-প্রতিফলিতালোকে জ্যোতি-ষ্মান্। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যে সকল জ্যোতিষ্ক, চন্দ্রের ন্যায়, গ্রহদিগের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, জ্যোতির্ব্বিদেরা তাহাদিগকে উপ-গ্রহ বলিয়া থাকেন।

সম্মার্জ্জনীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট আর এক প্রকারের জ্যোতিষ্কও কখন কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন ইহারা আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়, তখন ইহারা উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ধরিয়া সায়ং অথবা ঊষাকালে আকাশ-প্রান্তে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার পর আবার কয়েকদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়। জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহাদিগকে ধূমকেতু বলিয়া থাকেন। ইহারা স্বতঃ জ্যোতির্ম্ময়।

নিশাকালে নভোমণ্ডলে স্থানে স্থানে শুভ্রমেঘের ন্যায় এক প্রকারের পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলে তাহাদিগের মধ্য হইতে অস্পষ্ট ক্ষীণালোক বাহির হইতে দেখা যায়। নক্ষত্রদিগের সহিত ইহাদের প্রকৃতি-গত অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে ইহাদের আলোক নক্ষত্রালোক অপেক্ষা অনেকাংশে ক্ষীণ। ইহারাও স্বতঃ জ্যোতিষ্মান্। জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহাদিগকে নীহারিকা বলেন। নক্ষত্র অপেক্ষা নীহারিকায় পরমাণু-দ্বয়-মধ্যগত ব্যবধান অনেক বেশী। সেই জন্য নীহারিকায় পরমাণুদিগের পারস্পরিক সংঘর্ষণ অল্প এবং সংঘর্ষণ-জনিত আলোক ও ক্ষীণ।

নীহারিকানিচয়কে বিশেষভাবে অবলোকন করিয়া ও নীহারিকাতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা করিয়া জ্যোতি-র্ব্বিদেরা সৃষ্টিতত্ত্বের এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় বিশ্ব শূন্যময় ছিল ও সেই শূন্যমধ্যে বিশ্বোপাদানসম্ভূত পরমাণুনিচয় বিদ্যমান ছিল। পরে পারস্পরিক আকর্ষণধর্ম্মে কতকগুলি করিয়া পরমাণু পৃথক হইয়া অনেকগুলি জড়পিণ্ডের উৎপাদন করিল। ইহারাই নীহারিকার পূর্ব্বাবস্থা। তাহার পর উক্তপিণ্ডস্থিত পরমাণুগুলি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তাহাদের সংঘর্ষণ-জনিত উত্তাপে আলোক উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে বিশ্বসৃষ্টির প্রথমে নীহারিকা সৃষ্টি হইয়াছে। অন-

স্তর নীহারিকাস্থিত পরমাণুনিকর আরও সমীপবর্ত্তী হইয়া-সংঘর্ষণাধিক্যবশতঃ উত্তাপাধিক্য ও উত্তাপাধিক্য বশতঃ আলোকাধিক্য উৎপাদনকরিলে উক্ত নীহারিকা গুলিই নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছিল। সূর্য্য একটা নক্ষত্র বিশেষ। নক্ষত্রপরমাণুনিচয় প্রথমাবস্থায় তত দৃঢ়সংবদ্ধ থাকে না। সুতরাং প্রথমাবস্থায় নক্ষত্র গ্রহের ন্যায় কঠিন নহে; বরং তরল বলিলে বলা যাইতে পারে। নীহারিকা নক্ষত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াই ঘুরিতে থাকে। সুতরাং নক্ষত্রদিগের তারল্য ও আবর্ত্তনবশতঃ নক্ষত্র হইতে অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ ও গ্রহ হইতে অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া উপগ্রহ সংগঠিত হইয়াছিল। গ্রহ ও উপগ্রহাবলী ক্রমশঃ আকর্ষণ ও তাপ-বিকিরণদ্বারা কাঠিন্য ও শৈত্য প্রাপ্ত হইলে তাহারা জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে। তখন প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন-প্রভাবে উক্ত জড়পিণ্ড হইতে ক্রমশঃ জীবসৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর, জীব হইতে সমাজ, সমাজ হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে।

এইরূপে সৃষ্টির প্রথমাবস্থা হইতে ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত বিশ্ব ক্রমশঃ উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

শ্রাবণ—১৩০৫।

শ্রী ——

ভুলিলে কি ভুলা যায় তা'য় ।

১

কত দিন—কতবার প্রতিজ্ঞা করেছি স্থির
নীরব নির্জ্জনে বসি'—ভুলিব তাহায় !
কত রণ করিয়াছি বিদ্রোহী হৃদয়সনে,
কত রক্ত অশ্রুরূপে ঝরেছে ধরায় !
অবশ হইলে প্রাণ— দুর্ব্বল হইলে হৃদি
মাটিতে লুটায়ে পড়ি' কাঁদিতাম হায় !
স্নেহের অঞ্চল দিয়া ধরণী লইত শুষি'
তপ্ত অশ্রু—সদ্যছিন্ন বারি-বিন্দু-প্রায় !

২

তবু নয়—তবু নয়— নিঠুর নিয়তি সম
বেড়ে আছে সে পাষাণী জগৎ সংসার !
সমগ্র এ বিশ্বরাজ্যে যেখানে লুকাতে যাই
ছায়ার মতন আসে—সত্বাহীনাকার !
সাগরের নীল জলে কিম্বা নীলাম্বর-তলে
সেই ছায়া প্রাণ-হীনা ভাসে অনিবার !
তরুর পল্লব-মাঝে— ক্ষুদ্র লতিকার বুকে
লুকায়ে লুকায়ে দেখে কর্ম্ম অভাগার !
প্রকৃতি নিশীথ-সুপ্ত— আধ-সুপ্ত চাঁদ-মাঝে
জ্যো'স্না হ'য়ে জেগে থাকে রূপ-পূর্ণিমার !

ধীরে যবে মুদে আসে চাঁদের আঁখির পাতা
উষা হয়ে হাসে বালা আনন্দে অপার!

৩

ক্ষমা কর ক্ষমা কর— শান্তি দাও অভাগায়,—
ব্যাকুল কাতর কণ্ঠে বলেছি তাহায়!
কে শুনিবে?—ছায়া তার? অচেতন জড়-প্রায়—
সে কেমনে দিবে ক্ষান্তি—দিবে শান্তি হায়!

৪

একটি দিনের শুধু— এক মুহূর্ত্তের মাঝে—
একটি পলক-ক্ষেপে এত বিনিময়!
তারপর দিন দিন মাস পিছে বর্ষ গেছে
কত দিবা—কত নিশা অন্ধকারে লয়!
কত হাসি—কত কান্না সুখরোল, হাহাকার
জন্মে মরে গেছে কত মানব-হৃদয়!
শুধু লয়ে আছি আমি সেই শুভ মুহূর্ত্তের
এতটুকু কেনা-বেচা জয় পরাজয়!

৫

তাহারই কেন্দ্র লয়ে ঘুরিতেছি ফিরিতেছি :
পৃথ্বী-ব্যোম জুড়ে আছে তার আকর্ষণ!
আছে রূপ, রূপে দীপ্তি,— আছে নেই নাহি জানি
শুধু আমি জেগে আছি তা'র আরাধন!

সে উদ্দেশ্য, সেই পথ, সেই গতি, মুক্তি মম
সেই পুণ্য, সেই পাপ, প্রেম-উপাসন!
কেমনে ভুলিব বল— ভুলিলে যায় না ভুলা—
আমি ক্ষুদ্র, অনন্ত সে সম্বন্ধ-বন্ধন!

জ্যৈষ্ঠ—১৩০৫। শ্রীযতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্গোৎসব।

বর্ষান্তে যখন প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করে, ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশ-পট যখন অগণন বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত হইতে আরম্ভ করে, তটিনী যখন মমতাবতী হইতে আরম্ভ করে, ভীষণা তরঙ্গিণী যখন বীচি-কর-কিশলয়দ্বারা চিরসঙ্গিনী তীর ভূমিকে স্পর্শ করিতে আরম্ভ করে, প্রকৃতি যখন অশ্রুপ্লাবিত গম্ভীর শোকময়ী মূর্ত্তি ত্যাগ করতঃ আনন্দময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, যখন বর্ষা-বিধৌত প্রকৃতি নিজ নির্ম্মল অঙ্কে পরিস্ফুট প্রসূন-সম্ভার ধারণ করতঃ স্মিতমুখে শরৎ ঋতুর সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্রসর হয়, সেই সুন্দর সময়ের প্রারম্ভ হইতে যুগ যুগান্তরাবধি কোন এক ভাবী অতুলানন্দ-আশায় বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উৎফুল্ল হইতে থাকে। শরতে শারদার আগমনে সকলেই আনন্দিত। ক্রেতা, বিক্রেতা, ভক্ত, অভক্ত এমন কি

পথিক পর্য্যন্ত আনন্দিত। ক্রেতা মনোমত দ্রব্য পাইবার আশায় আনন্দিত, কিছু লাভের প্রত্যাশায় বিক্রেতা আনন্দিত, মা জগদম্বা আসিবেন বলিয়া ভক্ত আনন্দিত, অভক্ত ছুটীর কয়টা দিন আমোদ-আহ্লাদে কাটাইবে বলিয়া আনন্দিত আর কর্দ্দমের উপর দিয়া পথ চলিতে হইবে না বলিয়া পথিক আনন্দিত। আজ এই শ্মশান-তুল্য বঙ্গদেশের চির-নিদ্রিত বঙ্গবাসীর যেন চির-নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। এই চির-নিদ্রিত বঙ্গদেশ কেন এত আনন্দিত? কেন আনন্দিত? এই সুখের শরতে শারদীয়া আসিবেন, তজ্জন্য এত আনন্দিত। এখন দেখা যাউক যে এই শারদীয়োৎসব কোন সময় হইতে ও কি কারণে এই দেশে চলিয়া আসিতেছে।

ত্রেতাযুগে যখন স্বর্ণলঙ্কা বীরশূন্য, দশগ্রীব রাবণ অম্বিকাকে স্মরণ করিয়া রণস্থলে আগমন করিলেন; মহামায়া রথোপরি দশাননকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। রামচন্দ্র মহামায়ার ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া হতাশ্বাস হইলেন, অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। দশানন শত্রুকে নিরস্ত্র দেখিয়া লঙ্কাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বর্গে দেবকুল অতীব বিষণ্ণ হইলেন—সুরপতি ইন্দ্র পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন, বিরিঞ্চি রামচন্দ্রকে শক্তি-উপাসনা করিতে অনুরোধ করিলেন। রামচন্দ্র অকালে-শরতে শুক্লাষষ্ঠীর প্রাতঃকালে কল্পারম্ভ করিলেন। সায়ং-

কালে বোধন আরম্ভ হইল। রামচন্দ্র অভয়ার মূর্ত্তিগঠন করিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। হনুমান সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিল। সার্থক-জন্ম হনুমান্! বৈষ্ণবধর্ম্মের চূড়ান্ত তুমিই শিখিয়াছিলে! ধন্য তোমার প্রেম! ধন্য তোমার ভক্তি! রামচন্দ্র সাত্বিকভাবে ভগবতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই মহোৎসবে মাতিল। সপ্তমী, অষ্টমী, আমোদ-আহ্লাদে কাটিল। নবমীতে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত প্রেমাশ্রুপ্লাবিত-নেত্রে ভগবতীর মুখপানে চাহিয়া অর্চ্চনা করিতে বসিলেন। শঙ্করী অদৃশ্য থাকিয়া রামচন্দ্রের পূজা গ্রহণ করিলেন। শঙ্করীর অদর্শনে দাশরথির শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। রামচন্দ্র নিরাশ্বাস হইলেন। বিভীষণ পরামর্শ দিলেন,—"অষ্টোত্তর-শত নীল পদ্ম দেবীর পাদপদ্মে উপহার-প্রদান করুন।" হনুমান অমনি রামচন্দ্রের আদেশ গ্রহণ করতঃ ও বিভীষণের নিকট স্থানের আভাস লইয়া পবন-গমনে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে জয় জয় শব্দে সমুদ্রতট কাঁপাইয়া হনুমান রামচন্দ্রকে অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম আনিয়া প্রদান করিল। রামচন্দ্র সমস্ত পদ্ম দেবীর পদতলে রাখিয়া একে একে উপহার দিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসলা ভক্তের হৃদয় পরীক্ষার্থ একটি পদ্ম হরণ করিলেন। গণনায় একটি মিলিল না। ধনুর্ব্বাণকরে রামচন্দ্র নিজের নলিনাক্ষি উৎপাটন করিয়া দেবীপদে উপহার দিতে উদ্যত হইলেন।

শঙ্করী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা রূপ ধারণ করতঃ রামচন্দ্রকে বর দিলেন,—"তুমি বিজয়লক্ষ্মীর সহিত তোমার অঙ্কলক্ষ্মীলাভে কৃতকার্য্য হইবে।"

এখনও পর্য্যন্ত সেই পূজা চলিয়া আসিতেছে। একমাস দুইমাস পূর্ব্ব হইতে কত আয়োজন, আস্ফালন : পূজার সময় কত উৎসব আনন্দ; কিন্তু বিজয় লাভ কিসে হয়? শরীরত নানা বসনভূষণে ভূষিত হয় কিন্তু মনত নব উদ্যমে উৎসাহিত হয় না। ত্রেতার অকাল-বোধনে বিজয়লাভ হইলে বিজয়ীদল প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর বিজয়ালিঙ্গন করিয়াছিলেন কিন্তু রাক্ষসাপহৃতা সীতার উদ্ধার আমাদের ভাগ্যেত ঘটে না। বাঙ্গালির এমন উৎসব আর নাই; কিন্তু এক্ষণে রজো বা তমোগুণাবলম্বী সাত্বিক আচার ব্যবহার ব্যতীত এই নিত্যানন্দলাভ সুদূরপরাহত; সে আনন্দ ব্যতিরেকে চিরানন্দলাভের অধিকারী হওয়া যায় না।

মা ভক্তবৎসলে! তুই তোর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস্, কিন্তু মা! তোর সাধনাহীন, অকৃতী পুত্রের প্রার্থনা কি পূর্ণ করিবি না? মা পুত্র যতই দুষ্ট হউক না, মা হয়ে ছেলের ক্রন্দন কে সহ্য করিতে পারে? মা তুই যেরূপে রামচন্দ্রকে দেখা দিয়াছিলি সেই——

"জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং
লোচনত্রয়-সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু-সদৃশাননাং।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং
নবযৌবন-সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং।
সুচারু-দশনাং দেবীং পীনোন্নতপয়োধরাং
ত্রিভঙ্গ-স্থান-সংস্থানাং মহিষাসুর-মর্দ্দিনীং।
মৃণালায়ত-সংস্পর্শদশবাহু-সমন্বিতাং”,—রূপে
দেখা দেমা—দেখিয়া জন্ম সার্থক করি।

আশ্বিন—১৩০৪। শ্রীসঃ——

ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি।

প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগীর নিকট এই বিশাল সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবী ভগবানের শ্রীমন্দির, নির্ম্মল পবিত্র চিত্তই তীর্থ এবং একমাত্র সত্যই অবিনশ্বর শাস্ত্র। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি সর্ব্বদা সকল স্থানে ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করতঃ নির্ভয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। পার্থিব সুখ, পার্থিব সম্পদ ক্ষণস্থায়ী জলবিম্বের মতন বোধ হয়। শুদ্ধ একমাত্র সত্য এবং. সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী পরমপিতা পরমেশ্বরই তাঁহার অবলম্বন। তিনি জানেন দৃঢ় বিশ্বাস ধর্ম্মের মুল এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ‘পরের মঙ্গলের জন্য নিজস্বার্থ বলিদান করাই প্রকৃত বৈরাগ্য’ এই

মহাবাক্য তাঁহার প্রতি শিরায় শিরায়, প্রতি ধমনীতে ধমনীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহাকে পরহিতব্রতে রত করিয়া দেয়। নিশা প্রভাত হইলে, যখন বিহঙ্গমগণ কলরব করিতে থাকে এবং দিবাকর রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, তখন তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া বিভুগুণ গান করিতে থাকেন। প্রাবৃটের জলধারায় বৃক্ষলতাদি স্নাত হইয়া, নদনদী পরিপূর্ণ হইয়া, প্রকৃতিদেবী যখন অপূর্ব্বশোভা ধারণ করেন, তখন তিনি অচিন্ত্য বিশ্ব রচয়িতার রচনাসন্দর্শনে পুলকিত এবং রোমাঞ্চিত হন। তিনি যেখানে থাকুন না কেন তথাপি তিনি পরমপিতা পরমেশ্বরর ভবনে অবস্থান করিতেছেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও তিনি দুঃখিত নহেন কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই।

সুনির্ম্মল অন্তঃকরণ তাঁহার মহাতীর্থ। তাঁহার চিত্ত পবিত্র বলিয়া তিনি বলীয়ানদের হইতে শ্রেষ্ঠতম বলীয়ান, তেজস্বী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী, এবং মহাধনী হইতেও ধনী। চিত্ত যাঁহার পবিত্র তাঁহা হইতে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন ব্যক্তি? সুনির্ম্মল অন্তঃকরণরূপ মহাতীর্থে তিনি ভগবানকে দেখিতে পান এবং তজ্জন্য নিত্যানন্দ উপভোগ করেন।

তিনি জানেন যদি শাস্ত্রে কিছু থাকে তাহা হইলে সত্যই একমাত্র অবিনশ্বর শাস্ত্র। যেহেতু সকল ধর্ম্মে, সকল শাস্ত্রে,

সকলদেশের পণ্ডিত ও সাধু এবং ভক্তগণ একমাত্র শুদ্ধ সত্যকেই সমাদর করেন। তাঁহার মনে সত্য, বাক্যে সত্য, এবং কার্য্যেতে সত্য। অর্থাৎ তিনি মনে যাহা সত্য: ভাবেন বাক্যেতে সেইরূপ বলেন এবং বাক্যেতে যেরূপ বলেন কার্য্যেতে সেইরূপ করেন। অতএব দেখিতে পাওয়া যাই-তেছে যে ঈশ্বরানুরাগী চিরজীবন সত্য পথে থাকিয়া এবং সত্যকে অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখা এবং যে কার্য্য করি বা করিব তাহাতে তিনি আমার সহায় আছেন এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকা ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির লক্ষণ। তিনি কোন বিষয়ে নিরুৎসাহ হন না, কারণ তিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন যে পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার সহায়। সেই জন্য তাঁহার সকল বিষয়ে মনোভিলাষ পূর্ণ হয়। বিপদে তিনি অধৈর্য্য না হইয়া—পরমেশ্বর তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন—এই ভাবিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হন। সম্পদে তিনি ভগবানকে ভুলিয়া যান না।

ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তিনি তাঁহার উপা-সনা বলিয়া জানেন। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি জানেন যে ঈশ্বর তোষামদ-প্রিয় নহেন। তিনি যে কার্য্যই করুন না, সে সমস্ত ঈশ্বরের অবিদিত নহে। তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিব অথচ তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব এরূপ কপটতা ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিকে আশ্রয় করিতে পারে না।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে যখন তিনি সন্তুষ্ট হন, তখন তাঁহার উপাসনা না করিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই।

পরের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি আপনার সুখ, আপনার সচ্ছন্দতা অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারেন। পরদুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয় এবং সেই দুঃখমোচনে তিনি কৃতসংকল্প হন। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তিনি তৎপ্রতিবিধানে নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই কৃপাবলে তিনি তৎসম্পাদনে কৃতকার্য্য হন। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি যে কেবলমাত্র অন্যের পার্থিব সুখসচ্ছন্দতাবিধান করেন, তাহা নহে; পরন্তু উপদেশদানে ও দৃষ্টান্তদ্বারায় যাহাতে তাহারা সত্য পথে চলিতে পারে, তাহাদিগের ধর্ম্মে মতি থাকে এবং পরমাত্মায় বিশ্বাস থাকে তাহা করিতেও ত্রুটি করেন না।

আশ্বিন—১৩০৪। শ্রীপুলিনবিহারী সেন-গুপ্ত।

শিশির-কুমার।

প্রথম পত্র।

প্রাণ-চুরি।

বর্দ্ধমান, কাইগ্রাম; ১৩ই বৈশাখ, ১২—।

ভাই অভয়,

এই দশ বৎসর কত দেশবিদেশে ভ্রমণ করিলাম, কোথাও কেহ আমার এক কড়া কানা কড়িও সরাইতে

পারে নাই ; কিন্তু কি কুক্ষণেই এতদিন পরে দেশে আসিলাম, এখানে আসিয়া দুই দিন না যাইতে যাইতেই একজন আমার 'অমূল্য-রতন' হৃদয়টী চক্ষুদান দিয়াছে!

এক শান্ত-প্রকৃতি-সম্পন্না কিশোরী (বোধ হয় দ্বাদশী) সাঁতার কাটিতে গিয়া জলে ডুবিয়া মরিতেছিলেন, উদ্ধার করিলাম ; তা' তিনি এমনই কৃতজ্ঞ যে প্রাণদাতার প্রাণটী চুরি করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন!

আমি এতদিন দেশে ছিলাম না, এখানকার অনেককেই ভুলিয়া গিয়াছি, সুতরাং তুমি যদি এখন এই সাধু-বৃত্তিশালিনী fair-sexটীর পরিচয় জানিতে চাও ত বলিতে পারিব না। এই ললনাকুলভূষণটীকে উদ্ধারান্তে বক্ষে করিয়া যেখানে পহুঁছিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম সেটী একটী কুটীর ; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেছি এটী দীনকুলোদ্ভবা। তা' দীনার এত 'ভিরকুটী' কেন, বলিতে পার ?

তুমিত সর্ব্বদা দেশে আসিয়া থাক—গ্রামের পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাদের বাড়ী—বলিতে পার, এই রত্নটীকে আমার হৃদয়ে ধারণ করা যায় কি না ? আশা করিতে পারি কি ? না আবার দেশ ছাড়িতে হইবে ?

আজিকালি আমার শারীরিক অবস্থা বড় মন্দ নাই ; মানসিক অবস্থা কিন্তু শোচনীয়! তুমি কেমন আছ ?

ইতি—— অভিন্ন হৃদয়

শিশির।

দ্বিতীয় পত্র।

কান্নাহাটী।

বর্দ্ধমান, কাইগ্রাম, ১৭ই বৈশাখ, ১২—।

প্রিয়তমেষু।—

এতদিন পরে তোমার বন্ধু নির্ম্মল-চন্দ্রের হৃদয়রত্নটী বুঝি বেহাত হয়! জমীদারদের বড় বাবু, শিশির-কুমার, এত দিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নির্ম্মলের সর্ব্বস্বটী একদিন জলে ডুবিয়া যাইতেছিল, তিনি তাহাকে উদ্ধার করিয়াই দাবী করিয়া বসিয়াছেন। তা' তাঁহার দাবীটা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই কিন্তু এদিকে তা' হলে তোমার নির্ম্মল-চন্দ্র যে অস্ত যায়!—আমার নিশীথ-কুসুম ত শুখায়ই!

এদিকে নির্ম্মলের পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণ,—"দুইটী হাজার টাকা না পাইলে নির্ম্মলের বিবাহ দিব না।" (অমলার মায়ের কাছে বলিয়াই দুই হাজার; কারণ মেয়েটী দেখিতে ভাল ও স্বগ্রামের। নহিলে চারি হাজার!)

অমলার মা দুখিনী বিধবা অত টাকা কোথায় পাইবেন? কাজেই এ বিবাহ এক প্রকার অসম্ভব। এদিকে শিশির-বাবু অমলার মায়ের কাছে আপন অভিপ্রায় এক প্রকার জানাইয়াছেন। আর তিনি প্রায় প্রত্যহই তথায় বিবিধ ছল-ছুতা করিয়া যেরূপ আনাগোনা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে কি হয় বলা যায় না। অমলার মাতা কিন্তু কন্যার

মুখ চাহিয়া এখনও কিছু বলেন নাই কিন্তু নির্ম্মলের অর্থ-লোলুপ পিতা-মহাশয় যদি নিতান্তই না রাজী হন ত তিনি কি এমন সুপাত্রটী হাতছাড়া করিবেন?—হয়ত তাহা হইলে কথা দিয়াই ফেলিবেন। তাহা হইলে কিন্তু বড় মুস্কিল হইবে!

প্রিয়তম তুমিই আমার বলবুদ্ধি। অমলার কান্না ত আর দেখা যায় না, কি করিব বল? তোমারত জমীদারদের বড়-বাবুর সঙ্গে আলাপ আছে, তাঁহাকে কোন রকমে নিরস্ত করিতে পার না কি?

আমরা সকলে ভাল আছি। তোমার কুশল-সংবাদ দিবে। দাসীর ও ছেলেদের প্রণাম জানিও। ইতি——

তোমারই নলিনী।

তৃতীয় পত্র।

পরামর্শ।

কলিকাতা; ১৯শে বৈশাখ, ১২—।

প্রাণের নলিনি!

তোমার ১৭ই তারিখের পত্র পাইলাম। তোমরা সকলে ভাল আছ পাঠ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। ঈশ্বরানুগ্রহে আমি এখানে বেশ ভাল আছি।

অমলার সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিয়াছ—আমি বলি, নির্ম্মলের সহিত যখন বিবাহ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, তখন অমলার

বৃথা কাঁদিয়া কাটিয়া কি হইবে? হিন্দুর মেয়ে একজনকে ত বিবাহ করিতেই হইবে; তা' শিশির-কুমারের মত অমন একজন রূপবান্, গুণবান্ ও ধনবান্ লোক যখন তাহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়াছেন তখন তাহার অমত করা কোন মতেই উচিত হয় না। অমলাকে তুমি এই কথাগুলি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিও।

শিশির-কুমারও অমলার সম্বন্ধে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি এই সঙ্গে পাঠাইতেছি, আপনি পাঠ করিও এবং অমলাকে পাঠ করাইও। শিশিরের পত্রের আমি এখনও কোন প্রত্যুত্তর দিই নাই; তোমার পত্র না পাইলে তাঁহাকে চিঠি লিখিব না। অমলার কি মত জানিতে চাই।

আর কি লিখিব? তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

তোমারই অভয়।

চতুর্থ পত্র।

প্রেমোল্লাস।

বৰ্দ্ধমান, কাইগ্রাম; ১৯শে বৈশাখ, ১৩—।

বন্ধু হে!

আজিকালি আমি এক অপূর্ব্ব চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছি: সেই বিদ্যা বলে দিবা-বিভাবরী এক সংজ্ঞাহীনা বালিকার

মূর্চ্ছিত-সৌন্দর্য্য আমার লোচনসমক্ষে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারি! শুধু উহাই নহে, আজিকালি আমি আবার সাধকও হইয়া পড়িয়াছি; আমি অমলা মন্ত্রের উপাসক; দিবা-নিশি জপ করি অমলা, অমলা, অমলা, অমলা! সুতরাং দেখিতে পাইতেছ আজকাল আমি কত ব্যস্ত: তবুও দেখ, তোমাকে উপর্য্যুপরি দুইখানি পত্র লিখিলাম; তুমি কিন্তু আজিও আমার পত্রের উত্তর দিলে না, ভাঁরি অন্যায়! আশা করি, এইবার পত্রপাঠ মদুদ্দেশে লেখনী-ধারণ করিবে।

তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করিতেছ, ঐ সংজ্ঞাহীনা বালিকাটীই বা কে, আর অমলাই বা কে? বন্ধু! "এ্যা-ও যে অ-ও সেই," দুই এক, দ্বিমূর্ত্তি নহে, মূর্ত্তি এক, তবে আমায় কার্য্য করায় দ্বিবিধ! আরও কতবিধ করাইবে কে জানে? অবশেষে পাগল না করিলে বাঁচি!

আমার চিত্রবিদ্যার আদর্শে, আমার সাধনার জপমন্ত্র অমলায়, আর আমার পূর্ব্ব পত্রে কথিত সেই সুশীলা বালিকাটীতে কোন প্রভেদ নাই তিনই এক—একে তিন!

আজকাল এই তিনের বাড়ী আমার অন্ততঃ দিনে দশ-বার যাওয়া চাই, নহিলে প্রাণ বাঁচে না! অমলা দুখিনীর দুহিতা, পিতৃহীনা, মায়ে ঝিয়ে সূতা কাটিয়া, পৈতা তুলিয়া যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতেই ইহাদের এক প্রকার চলিয়া যায়। তুমি কি ইহাদের চেন?

আমি স্বয়ং ঘটক হইয়া বিবাহের কথা ফেলিয়াছি। আজিও কোন সাফা জবাব পাই নাই। এখন দেখ কি হয়।

এখন আমার শরীর ও মন উভয়ই ভাল ; তুমি কেমন আছ? ইতি——

অভিন্ন-হৃদয়

শিশির।

পুনশ্চঃ—অমলার সম্বন্ধে তোমার আর কোন সন্ধান লইবার প্রয়োজন নাই।

শিশির।

পঞ্চম পত্র।

ভৎর্সনা।

বর্দ্ধমান, কাইগ্রাম ; ২১শে বৈশাখ ১২—।

প্রিয়তমেষু।

তোমার ১৯শে তারিখের পত্রে অমলার সম্বন্ধে যাহা পরামর্শ পাইয়াছি, তাহাতে আর কোন সময় তোমার নিকট কোন পরামর্শ লইবার প্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়াছে। তোমা-দের পুরুষজাত অমনি হৃদয়হীনই বটে! তোমরা যত শীঘ্র লোককে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পার আমরা তত শীঘ্র পারি না।—শীঘ্র পারা পারি কি—কখনই পারি না!

তুমিই না একদিন আমায় বলিয়াছিলে যে, যে রমণী

একজনকে ভালবাসিয়া অন্যকে বিবাহ করে সে ব্যাভিচারিণী? তা' আজ আবার একি পরামর্শ দিতেছ? অমলাকে তুমি ব্যাভিচারিণী হইতে বল না কি?

শিশির-বাবুর পত্র পাঠ করিয়া দুঃখিতা হইলাম। তা' দুখিনীর প্রতি তাঁহার অত অনুগ্রহ কেন? যাহা হউক, তাঁহাকে সবিশেষ কহিয়া একবার ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিও। তিনি যদি হৃদয়বান্ লোক হয়েন ত নিরস্ত হইবেন। নচেৎ হতভাগিনীর অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

আমরা সকলে ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? বলি, সকলের বাড়ী আসা হয়, তোমার কি হয় না? ওকালতি করিতেছ, আইন জ্ঞান আছে, তা এমন বেআইনী কাজ করা কেন? ছুটিতে বাড়ী না আসা কি আইন-বিরুদ্ধ কাজ নয়?

আর কি লিখিব? আমাদের সকলের প্রণাম জানিও। ইতি——

তোমারই নলিনী।

ষষ্ঠ পত্র।

উপদেশ।

কলিকাতা; ২২শে বৈশাখ, ১২— ।

প্রিয় শিশির!

তোমার দুইখানি পত্রই যথাকালে আমার হস্তগত হই-

য়াছে ; এতদিন তোমার পত্র দুইখানির উত্তর দিই নাই, অপরাধ করিয়াছি। আশা করি বন্ধুর এই অপরাধ নিজ-গুণে মার্জ্জনা করিবে।
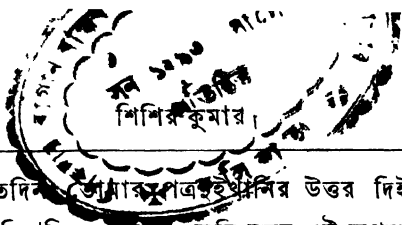
দ্বিতীয় পত্রে তুমি অমলার সম্বন্ধে (অমলাকে আমি বিলক্ষণ চিনি!) আর কোন সন্ধান লইতে বারণ করিয়াছ বলিয়া আমি আর তাহার কোন সন্ধান লই নাই। তবে তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইবার পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে যে কতকগুলি কথা জানিতে পারিয়াছি, কর্ত্তব্যানুরোধে তাহা আমি তোমাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি।

তুমি লিখিয়াছ 'আমার অমলা'। আমি বলি তোমার নহে নির্ম্মল-চন্দ্রের অমলা! (নির্ম্মল-চন্দ্রকে বোধ হয় ভুলিয়া যাও নাই?) অমলার ও নির্ম্মল-চন্দ্র বটে!

এতদিনে, কবে ওই "দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিয়া" যাইত, কেবল নির্ম্মল-চন্দ্রের অর্থ-প্রিয় পিতা হাজারী দুই সিন্দুক খুলিয়া বসিয়াছেন বলিয়া হইতেছে না।

তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইবার পূর্ব্বে অমলার সম্বন্ধে উল্লিখিত সমাচার পাইয়াছি। এখন, তুমি হয়ত বুঝিতে পারিতেছ যে অমলার মাতা কন্যাদায়ে পড়িয়া যদি বা তোমাকে কন্যাদান করেন, কন্যা তোমাকে হৃদয়-দান করিবে না। তাহার সে ক্ষমতা নাই; থাকিলে সে তাহার জীবন-দাতাকে এই সামান্য উপহার-প্রদানে কখনই পরাঙ্মুখ হইত না।

আমি জানি তুমি উপরোক্ত কথাগুলি শুনিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিবে—হয়ত, আবার দেশ ছাড়িতে চাহিবে। কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ-অনুরোধ তাহা করিও না। তুমি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিও দেখি, অমলার প্রতি তোমার যা' ভালবাসা তাহা প্রকৃত ভালবাসা না রূপজমোহ। আমিত বলি রূপজমোহ। তুমি তাহার এ কয়দিনে এমন কি গুণ দেখিলে যাহাতে তোমার চিত্ত তাহার প্রতি সমাকৃষ্ট হইল? বোধ করি কিছুই দেখ নাই। অতএব ভাই, বৃথা রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া একটা কিছু অকাণ্ড করিও না। ছি ছি! লোকে বলিবে কি? চিত্ত-সংযম কর; চিত্ত-সংযম করা মুখে বলা অপেক্ষা যে কাজে করা ঢের কঠিন তাহা আমি জানি। কিন্তু ভাই স্মরণ রাখিও পুরুষের পুরুষত্ব উহাতেই!

দুইদিন অন্য বিষয়ে চিত্তনিবিষ্ট কর, সব ভুলিয়া যাইবে। রূপজপ্রেম বালুর রচনা, দুই দিনেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আমি বেশ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি—

অভিন্ন-হৃদয়

অভয়।

সপ্তম পত্র।

নর-দেবতা।

বর্দ্ধমান, ধাইগ্রাম; ২৫শে বৈশাখ, ১২—।

স্বামিন্!

পূর্ব্ব পত্রে তোমাদের পুরুষজাতিকে যে কতকগুলি গালি দিয়াছি, কোন একটী ঘটনা ঘটাতে তাহা আজ আমায় ফিরাইয়া লইতে হইতেছে।

কল্য নির্ম্মল-চন্দ্রের সহিত অমলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মলের পিতার হাজারী সিন্দুক ডুইটী অবশ্যই পূর্ণ হইয়াছে। তুমি হয়ত প্রশ্ন করিতেছ, অমলার মাতাত নিঃস্ব, টাকা দিল কে? কেন, শিশির-কুমার! শুধু টাকা দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন্ নাই। এ বিবাহের সমুদায় উদ্যোগই যদি তিনি না করিয়া দিতেন তাহা হইলে এত শীঘ্র হয়ত বিবাহ হইত না। হঠাৎ কায হইয়া গেল বলিয়া তোমাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই।

অমলা ও নির্ম্মল অবশ্যই এ বিবাহে খুব সুখী হইয়াছে। কিন্তু শিশির-কুমার? শিশির-কুমার কি সুখী হইয়াছেন? তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়াত কিছুই বুঝা যায় না; বরং সুখীই মনে হয়, কেন না এই ঘটনাসংঘটন-কালে তাঁহার অধর-প্রান্ত হইতে মুহূর্ত্তেকের জন্যও হাসি বিলুপ্ত হয় নাই। আর তিনিই ত ইহার উদ্যোক্তা!

এখন এসো তোমার দেব-প্রকৃতি বন্ধুকে একবার আলি-ঙ্গন করিবে এস! আর একবার অমলা ও নির্ম্মলের

মিলনানন্দ দেখিবে এস! এখনও কি করিতে কলিকাতায় রহিয়াছ? ছুটীতেও কি তোমার কায ফুরায় না? খোকা কয়দিন তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই কান্না জুড়িয়া দিয়াছে, তাহাকে থামাইয়া রাখা দায় হইয়াছে! আর আমার কান্নার কথা কিছু লিখিব কি?

আমরা সব এখানে ভাল আছি; তুমি কেমন আছ লিখিবে। আজ আর বিশেষ কিছু লিখিবার নাই, খালি জানিতে চাই ষ্টেশনে কবে ঘোড়া পাঠাইতে হ'বে? দাসীর ও ছেলের প্রণাম জানিও। ইতি—— তোমারই

নলিনী।

অষ্টম পত্র।

প্রতিবাদ।

বর্দ্ধমান, কাইগ্রাম; ২৬শে বৈশাখ, ১২—।

সুহৃদবরেষু।

ভাই অভয়, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। অমলাকে আমি প্রকৃতই ভালবাসি; রূপজ-মোহ নহে। তাহার ন্যায় নারীকে ভালবাসিতে গুণের আবশ্যক হয় না, কারণ

"To see her is to love her
And love but her for ever."

আজ কয়দিন হইল এখানে এক মজা হইয়া গিয়াছে কি?—কেন বলিব? ইতি—— অভিন্ন-হৃদয়

ফাল্গুন—১৩০৪। শিশির।

মাইকেল মধুসূদন-স্মৃতি।

স্বচ্ছ শুভ্র সমুজ্জ্বল প্রসন্ন-সলিল—
'দুগ্ধ স্রোতরূপী' আহা—'কবতক্ষ'-তীরে
সুন্দর 'সাগর-দাঁড়ি' বক্ষে যশোরের—
কবি-জন্ম-স্থান। পিতা রাজনারায়ণ
মহামতি, দত্তবংশে প্রসিদ্ধ প্রাচীন।
জননী-জাহ্নবীদাসী, জাহ্নবীর মত
করুণার মহাসিন্ধু। পালিলা যতনে
শ্রীমধুসূদন,—যেন শ্রীমধুসূদন
নবঘন শ্যামরূপ,—লাবণ্য উজ্জ্বল!
প্রতিভা-প্রদীপ্ত আঁখি,—যুগল কমল
প্রভাতের;—মহিমায় দিব্য প্রভাময়!
আশৈশব অনুরাগে ছিলা পাঠরত
কত ভাবা! কত গ্রন্থ, কাব্য কত শত
জীবনের সঙ্গী করি' ভুলিত যতনে
তীব্র সংসারের জ্বালা, দাবার মতন
বিভীষণ,—পুড়ে যা'য় সংসার-কাননে
প্রাণী অগণ্য! প্রতিজ্ঞা পালনে অটল,—
সদসৎ জ্ঞানাতীত! চিরদিন তাই
উচ্ছৃঙ্খল চিরদিন আছিল জীবন!
অনুতপ্ত বুকে কত কাঁদিয়াছে—হায়—

নিশি দিন, উষ্ণ অশ্রু পড়েছে ঝরিয়া!
কিন্তু দিনেকের তরে মহত্ত্ব তাহার
হয় নাই বিচলিত—অটল শিখর!
নীল-মণিময় কান্তি নীলাম্বর যেন
অথবা নীলাম্বু যথা প্রেম-পারাবার!
উদার কবির চিত্ত পূর্ণ প্রেমময়!
পর দুখে কাঁদিত সে. বিকল হৃদয়
শরাহত·মৃগমত! ঝরিত নয়ন
পর ক্লেশে! রবি করে স্ফটিক যেমন
ঝলমলে, ঝলসিত সেই অশ্রুরাশি
প্রতিভার দীপ্ত আঁখি কোলে; মরি মরি,
কত শোভাময় আহা! জননী যেমন
বুলান যতনে স্নেহে পুত্র-ব্যথা স্থানে
কর-পদ্ম করুণার;—মুছাইত কবি
দীনের নয়ন-নীর সস্নেহ আদরে
উদার! তরুণ হৃদে জাগিত পিপাসা
পাশ্চাত্য-সভ্যতা-পূর্ণ জ্ঞান-পারাবার
হেরিবারে প্রকৃতির ইংলণ্ড সুন্দর!
মিটাইতে সে পিপাসা যাইয়া ছুটিয়া
জীবনের মরুময় শ্মশান ভীষণ
অতিক্রমি উপেক্ষায়,—সতত চঞ্চল!
অক্লান্ত হরিণ-শিশু ছুটিত যেমন

দূর জলাশয় বোধে আশার কুহকে
মরুভূমে! পিপাসায় হয়ে হতজ্ঞান।
সেই জ্ঞান উপর্জ্জিয়া বহু যত্ন ফলে
অমর করিলা নাম এ বঙ্গ-ভবনে
সেই জ্ঞানময়ী রাণী প্রতিভা সুন্দরী!
জনমি' 'অমিত্রাক্ষর' কবিতা নিগড়
খুলে দিলা, কল্পনার সমুচ্চ শিখরে
আরোহি', অক্লান্ত-পক্ষ বিহগীর মত
ভ্রমি কত শত দেশ গিরি নদ বন!

সেই প্রতিভার সৃষ্টি-লাবণ্য শিখায়
রূপ-বহ্নি তিলোত্তমা ; ধ্বংস্-রূপা জেগে
যেন নাশিতে সংসার ; দারুণ পিপাসা!
মরু-ক্লিষ্ট পথিকের মত জগত-সংসার
তৃষ্ণার্ত্ত, করিতে চাহে রূপ বারি পান
(অদ্ভুত কবির সৃষ্টি)—প্রতপ্ত অনল!
সেই প্রতিভায় জন্ম বীর মেঘনাদ
মেঘনাদ সমনাদে উন্মত্ত বারণ ;
পূর্ণ আশাময়হৃদি, পূর্ণ প্রেমময়!
নির্ভয় সিংহের শিশু বেড়ায় ভ্রমিয়া
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল, বিজয়-কৌতুকে
পূর্ণকাম! দৃপ্ত ভুজে করি' পরাজিত
দৈত্যকুলদল বজ্রী দেবকুল-রাজ!

স্নেহ-পাশে বাঁধা যার হৃদয়ের কাছে
শূলী ; বদ্ধা প্রেম-পাশে সৌদামিনী সম
বালা প্রমীলা রূপসী, চিরোজ্জ্বল, মরি,
আহা অনন্ত যৌবনা তন্বী সুষমায় !
আশাময়ী—প্রেমময়ী উৎফুল্লা উল্লাসে ;
নবীনা লতিকা যেন অঙ্কে বসন্তের
বিকশিত ফুলময়ী—পূর্ণ শোভাময়ী
আবেশ সোহাগে ; আহা প্রফুল্লা সতত !
পুন সে প্রতিভা-রাণী, দুখিনীর মত
অশ্রুজল—দুখশ্বাসে, অশোক-কানন
কাঁদাইয়া—কাঁপাইয়া, চির অন্ধকার,
ব্যথিত কাতর বক্ষ বীণাকণ্ঠ মত
উথলিলা সীতা-কণ্ঠে ;—মর্ম্মাহত ব্যথা,
নিরাশার কলেবর, ছায়ার মতন
অতি শীর্ণা—অতিদীনা—সত্তাহীনা প্রায় !
দুখ ক্লিষ্টা পাপিয়ার মত কাঁদিতেছে
থেকে থেকে, বনস্থল ক্রন্দন বিকল !
বন স্মৃতি কাঁদে যেন নিদাঘ জ্বালায়
বসন্তান্তে ! পক্ষবদ্ধা বিহগীর মত
নীরবে চাহিয়া থাকে চক্ষু ছল-ছল !
অতিভীতা, চ্যুত পত্র মরমর রবে !
পুন কভু সে প্রতিভা "ব্রজাঙ্গনা" পাশে

বিলাসিনী যমুনার নাচিতে নাচিতে
সুমন্দ মলয় প্রাণে মৃদু মধুস্বরে
বাঁশরীর সুরে যেন,—ভুলা'তে রাধায়——
প্রেমময়ী !—উন্মাদিনী ছুটিত বিবশে
উদ্ভ্রান্ত ! গুঞ্জরে অলি প্রফুল্ল প্রসূনে,
মুঞ্জরয়ে তরুলতা আনন্দ-বিহ্বলে ;
গায় পিকবর সহ আহা পিকবধূ
কুহু কুহু কুহুরবে, পাপিয়া তাহাতে
পূরিত ঝঙ্কার নিত্য নব নব তানে !
কপোত কপোতী সনে মুখে মুখে বসি
কত নব প্রেম কথা করে আলাপন
মৃদুস্বরে,—যেন নব দম্পতি যুগল,—
বসিয়া বিরলে তরু শাখার উপর !
নির্ম্মল চন্দ্রিকাস্নাত অনন্ত গগন
বিশাল উরসে পরি তারকার হার
অমূল্য, উদারভাবে প্রেমেতে বিভোর !
নিম্নে তার নিরমল সুশীতল ছায়া,
কালিন্দীর কাল জলে—স্বচ্ছ সুবাসিত,
রাধিকার পাছে যেন কহে কল কল
আসিছে আসিছে সই বাজাইয়া বাঁশী
রাধিকা-রমণ ওই শূন্য বৃন্দাবনে,
ফিরি' তোর প্রেমপাশে বিরহিনী বালা !

আহা সে প্রতিভারাণী ফিরিয়া আবার,
গম্ভীর কোমলরূপে বঙ্গ বিমোহিয়া,
বঙ্গমহিলার চিত্র আঁকিলা যতনে।
কভু শোকে—কভু দুঃখে,—সরোষে গর্জ্জিয়া
কভু মিনতির ছলে, কভু উপহাসে
কভু সোহাগের বাণী—কভু অভিমান
সধবা—বিধবা আর কুমারী-হৃদয়
চিত্রিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রসবিলা হায়
"বীরাঙ্গনা"—বীরাঙ্গনা সম তেজস্বিনী!
"চতুর্দ্দশ পদাবলী" সেই প্রতিভার
উদার মহত্বপূজা—চিরযোগী বেশে!
"শর্ম্মিষ্ঠা" ও "পদ্মাবতী" নাটক যুগল
বঙ্গের গৌরব, তবে নবীন উদ্যম
প্রতিভার—তবু মরি মধুর কেমন!
তবু তায় গাঁথা আছে কটি অশ্রুধারা!
আর, সে কুমারী কৃষ্ণা রাজপুত-সরে
সায়াহ্নের সরোজিনী করুণ কোমল!
কৃষ্ণকুমারীর দুখে, ঝিল্লিরব সনে
কেঁদেছিল নিশীথিনী বেদনা ব্যাকুলা
অতি কৃষ্ণতর ছায়ে ঢাকিয়া বদন!
না পূরিতে সব আশা জ্বলিতে জ্বলিতে
কোথা গেলে কবিবর, বঙ্গ পরিহরি?

বঙ্গ-কাব্য-কুঞ্জে মধু, কবিতা-কোকিল
চির বসন্তের ;—যশোর-হৃদয়-রত্ন।
শুনিতে উৎকর্ণ হয়ে আছে বঙ্গবাসী
পঞ্চম পূরিত প্রেম-বীণার ঝঙ্কার,
আদরে যা অর্পিলেন জননী তোমায়
সুকণ্ঠ ; সৌভাগ্যবান তুমি হে কবীশ !
কার ভাগ্যে কহ ফলে হেন আশীর্ব্বাদ ?
অতি ভাগ্যবান ভিন্ন কে পারে করিতে
মাতৃ পূজা,—অবশেষে লভিতে প্রসাদ !
সহস্র সংসার-জ্বালা, চির উচ্ছৃঙ্খলে
পূজিয়াছ ভক্তিভাবে চরণ মায়ের,
কবিতা-রসের সরে প্রমোদ গভীরে
তেঁই কেলি করিয়াছ রাজহংস সম !
কল্পনার সুনির্ম্মল সমুচ্চ শিখরে
পশিয়াছ মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মত
কুতূহলে ; রচিয়াছ যেই মধুচক্র,
প্রীতি ভরে—তৃপ্তিভরে গৌড়জন তাহে—
"আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি।"
যশের কিরীট শিরে করে ঝল-মল,
কোথা সে কিরীট শোভে রাজ শিরোপরে
মণিময় ? তুচ্ছ তাহা রাজ গরিমায়।
দরিদ্র আছিলে—তবু রাজ-রাজেশ্বর

নহে সমকক্ষ তব,—নহে সমকক্ষ
অসংযত চিত্ত,—তবু জিতেন্দ্রিয়গণ!
এস কবি মহাপ্রাণ—পূর্ণ জ্ঞানময়
অমর, ভাসিছে বঙ্গ আজি শোকনীরে!
আজি বাঙ্গালার আর নাহি সেই দিন।
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি পূর্ণ গরিমায়
ক্ষীণা দীনা শীর্ণা বেশ ঘুচিয়াছে আজ
তোমার কৃপায় কবি ;—এস একবার!
তব পদাঙ্কিত মার্গে করিয়া গমন
পশিতেছে 'কত যাত্রী যশের মন্দিরে।'
আজি কত প্রীতি-পুষ্প প্রফুল্ল কোমল
হৃদয়-নন্দন হ'তে চন্দন মাখায়ে,
বরষিছে বঙ্গকবি প্রীতি উপহার।
কত শ্লেষ-শেল বিদ্ধ করেছিল যত
ক্ষুদ্রমতি, আজি তারা কাঁদিছে বিষাদে!
আপনি মা বঙ্গভাষা কাঁদিছে বিরলে
তব শোকে, উদাসিনী গলিয়া প্লাবিয়া
শ্রাবণের মেঘ মত লুটায়ে লুটায়ে,
গগণ—বসুধা জুড়ে তিতি অশ্রুনীরে!
অযতনে আঁধারের ভিতরে মিশিয়া
ধূসর কপিস বর্ণ করেছে ধারণ!
আর কে ডাকিবে তাঁরে তোমার মতন

মুক্ত কণ্ঠে, মা মা বলে দিগন্ত কাঁদায়ে কাঁদায়ে
ভক্তি উছলিত বক্ষে বিভোর পরাণে।
আর কে তুষিবে তায় অম্বু কম্বুনাদে
তূরী ভেরী দামামায় গভীর গরজে
বীর কবি প্রসবিনী বাথানি মাতায়?

আর আসিবে না কবি, বুঝেছি বুঝেছি
মিছা করিতেছি আর আকাঙ্ক্ষা তোমার!
অযত্ন দেখিয়া তব কবীশ জননী
আদরে লয়েছে তুলে নিজ বক্ষ মাঝে,
স্নেহের অঞ্চলে মুছি নয়ন-আসার!
নিঠুর নির্ম্মম মোরা শুধু স্বার্থ-দাস!

তবে যাক্—কায নাই—ভাসি অশ্রুজলে
আমরা; পূজিতে দিও চির ভক্তিভাবে
স্মৃতি তব,—সৃষ্টি তব,—অনন্ত উদার!

ফাল্গুন ও শ্রাবণ—১৩০৪, ১৩০৫।

শ্রীযতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
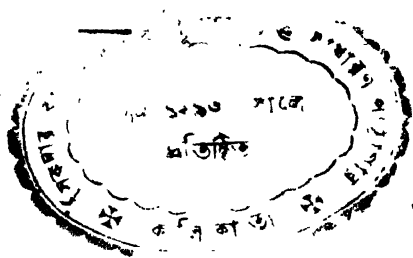
—প্রতি।

অনেক দিনের পর আজ তোমায় একখানি পত্র লিখিতেছি। হৃদয়ের কয়েকটী কথা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, তজ্জন্য তোমায় এই পত্রখানি লিখিতেছি। ইহাতে যদি কোন দোষ হয় তাহা হইলে আমায় মার্জ্জনা করিও। এই পত্রে আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সহিত যদি কোন রূঢ় কথা প্রকাশ পায় তাহা হইলে কিছু মনে করিও না, নিজগুণে ক্ষমা করিও। আর কথনও তোমায় পত্র লিখিব না, এই আমার শেষ পত্র। আমার হৃদয়ের যে কয়েকটী কথা তোমায় বলিবার জন্য এত উৎসুক হইয়াছি, হৃদয়ের সেই কথা কয়েকটী ভিন্ন ইহাতে আর কিছুই থাকিল না। অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রখানি শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিও, হৃদয়ের কথা কয়েকটী জানিও।

তুমি হাসিতেছ, হাস; তোমার হাসিবার দিন আসিয়াছে; কেন না, আমি এখন কাঁদিতেছি। আমি কাঁদি, তুমি হাস। তোমায় আর কথনও আমার এ কান্না দেখাইতে আসিব না,—আমার দুঃখের কথা শুনাইতে আসিব না। শুধু তোমার হাসি-টুকু দেখিতে ও তোমার দুটা সুখের কথা শুনিতে আসিব। তোমার হাসি-টুকু দেখিয়া ও তোমার দুটী সুখের কথা শুনিয়া আবার চলিয়া যাইব।

তোমার সুখের কথা, বসন্তের মলয়-সমীর-সংস্পৃষ্ট জ্যোৎস্না-প্লাবিত সরসী-বক্ষে মৃদু তরঙ্গ-ভঙ্গী, কিন্তু, আমার দুঃখের কথা—বর্ষার ঝটিকাহত অন্ধকারময়ী রজনীতে সমুদ্রের পর্ব্বত-প্রমাণ উত্তাল-তরঙ্গ। তোমার সুখের কথায় আমার হৃদয়ে সুখ-বুদ্বুদ্ উঠিলেও উঠিতে পারে। কিন্তু আমার গভীর শোকোচ্ছ্বাসে তুমি যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই।

মানুষ নির্দ্দোষ হইতে পারে না—যে দিন মানুষ নির্দ্দোষ হইবে সেই দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। আমারও দোষ আছে: কিন্তু তুমি আমার দোষকে যতদূর গুরুতর ভাব সে দোষ তত গুরুতর না হইলেও হইতে পারে। তুমি আমার হৃদয় বুঝিতে পার নাই তজ্জন্য আমার দুঃখে তুমি হাসিতেছ। আমি তোমার প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি, কিন্তু তুমি ভাব তাহা একটা মনের বিকার মাত্র। তোমার এই অবিশ্বাসেই আমার হৃদয়ে প্রলয় ঘটিয়াছে।

এই ছাড়া-ছাড়া-ভাবে তুমি হয়ত সুখী হইয়াছ। কিন্তু কই আমিত সুখী হইতে পারি নাই। তোমাকে একবার দেখিতে পাইলেই আমি সুখী হইতে পারি কিন্তু আজ তাহাতেও ত সুখী হইতে পারি না। তবে কি তোমায় দেখিতে পাই না। আমি দেখি না—ইচ্ছা করিয়াই দেখি না। প্রাণের আগুণ চাপিয়া রাখি। ভয় হয় তোমায় দেখিতে যাইলে তুমি কি ভাবিবে?

তোমার অবিশ্বাসেই আমার হৃদয়ে প্রলয় ঘটিয়াছে। তুমি যদি আমার হৃদয় বুঝিতে পারিতে, আমার শোচনীয় অবস্থা অনুভব করিতে পারিতে, তাহা হইলে তুমিও আমার চক্ষের জলের সহিত দু ফোঁটা চক্ষের জল মিশাইতে। কিন্তু তোমার হৃদয় নাই—তুমি, তুমি হৃদয়হীনা পাষাণী! সত্যই কি তুমি পাষাণী? আমি কি এতদিন ধরিয়া তবে পাষাণের পূজা করিলাম? না, তা' নয়। তুমি পাষাণী নও তুমি নিজের সুখে এত উন্মত্ত যে পরের দুঃখ দেখিতে পাও না। তুমি একবার বল যে আমি এতদিন ধরিয়া পাষাণের পূজা করি নাই। তুমি একবার বল যে তুমি হৃদয়-হীনা পাষাণী নও। তাহা হইলে আমার গভীর শোকোচ্ছ্বাসের সান্ত্বনা হইবে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে সুখ পাইব।

আমার শোকভার-প্রপীড়িত প্রাণ তোমার একটী কথায় সান্ত্বনা পায়। হা পাষাণি! তুমি কি সেই একটী সামান্য কথায় তাহাকে সান্ত্বনা করিবে না? তাহার করুণ, উদাস দৃষ্টিতে, তাহার দুঃখ-পূর্ণ কাতরতায় তোমার প্রাণে কি একটুও মমতার সঞ্চার হয় না? মিথ্যা কথা। তবে বল, যে, তোমার উপর আমার অবিশ্বাস নাই। হয়ত তোমার এই একটী কথায় আমার এই দুঃখক্লিষ্ট মরণোন্মুখ প্রাণে তড়িৎ-প্রবাহ বহিবে। হয়ত তোমার এই একটী কথায়, আমার শুষ্ক পত্রের ন্যায় ঝর'-ঝর' প্রাণ পুন-

রায় সজীব হইবে। বল তুমি—একবার প্রাণের সহিত বল,—"অবিশ্বাস গিয়াছে।"

আমি তোমার ভালবাসা চাহি না, চাই কেবল তোমায় একবার দেখিতে আর তোমার বিশ্বাস। হা পাষাণি! তুমি কি আমার দুঃখ-ক্লিষ্ট, মরণোন্মুখ প্রাণের শেষ মুহূর্ত্তেও সেই শান্তি-টুকু দান করিবে না?

জ্যৈষ্ঠ—১৩০৫। শ্রীসঃ —

সকলি তোমার।

১

জীবনের ঊষা হ'তে সঙ্গে আছ তুমি—
তবে, নাথ, কি ভয় আমার?
তোমারি মহিমালোকে আলোকিত আমি
ঘুচিয়াছে হৃদয়ের ঘোর অন্ধকার!

২

তোমার ইচ্ছায় আমি কর্ম্মেতে নিরত
চাহিব না সিদ্ধি সাধনার;
তব উপস্থিতি আমি বুঝি যে সতত—
এই স্বর্গ—অন্য স্বর্গে কি কায আমার?

৩

জীবনের অঙ্কে অঙ্কে বিরাজিছ তুমি

সর্ব্বময় সর্ব্বগুণাধার!

হৃদয়-আবেগ-ভরে প্রতিক্ষণে চুমি,—

চির-পুণ্যময়, নাথ, চরণ তোমার!

৪

তোমারি ইচ্ছায় ভুঞ্জি সুখ, দুঃখ-জ্বালা

সকলিত তোমার করুণা,

তোমারে হৃদয়ে ধ'রে বড় সুখ পাই—

ভুলে যাই শোক-তাপ সংসার-যাতনা।

ফাল্গুন—১৩০৪। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মালঞ্চ।

প্রতিদান।

১

রমণিরে, এতদিনে, এই দান—প্রতিদান,

এই উপহার!

গর্ব্বিতা রমণি, তোর এত টুকু নাহি স্নেহ,—

শান্তি দিতে পরাণে আমার!

২

কত যে জীবনক্ষেত্র হ'ল শুধু মরুময়,
বালুর রচনা ;
ফুরাল উৎসব, হাসি, নিভে গেল সুখদীপ,
কলরোল আর জাগিল না !

৩

কত প্রাণ জীব-হীন, জড়-মত রহে প'ড়ে,—
যেথায় সেথায় ;
রমণিরে, তোর বিষে এত শোধ—প্রতিশোধ,
কি নিঠুর—কে জানিত হায় !

৪

শিখেছ, রমণি, শুধু,— তেজ, দর্প, অহঙ্কার,—
শেখনি কি হায়—
রমণীর সার-ধর্ম্ম, উৎসর্গিতে নিজ আত্মা,
নিয়োজিতে নর-অর্চ্চনায় ?

৫

শিখেছ বর্ষিতে নারি ! হলাহল,—কত জ্বালা
বুঝনা তাহায় ;
এ বিশ্ব পুড়িয়া গেল রমণিরে ! তোর বিষে,—
জ্বালামুখী করিলি ধরায় !

৬

উদ্গীর্ণ করিছ নারি! হলাহল;—কি প্রকাণ্ড
নাচিছে মরণ!
বুঝি সৃষ্টি লোপ পায়,— কোথায় হে নীলকণ্ঠ!
নীলকণ্ঠে করহ ধারণ!

৭

যে গর্ব্ব প্রদীপ্ত মুখে যে গর্ব্ব চরণ-ক্ষেপে
ক্ষিতি টল-মল!
সম্বর-সম্বর নারি! আর না সহিতে পারি—
প্রকম্পিত হৃদয় দুর্ব্বল!

৮

নদী যথা বুকে আঁকি' দূর স্বর্গমার্গ-ছায়া
থাকে সুশীতল!
থাক্ তব ছায়া বুকে,— যেন স্পর্শ নাহি হয়,
প্রজ্বলিত রূপ-দাবানল!

অগ্রহায়ণ—১৩০৪। শ্রীযতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডেকোনা আমায়।

বিস্মৃতির কোল হ'তে
অশান্তির মাঝে যেতে,
ওগো আর ডেকনা আমায়!
নীরবে পড়িয়া আছি—
এক পাশে—এক কোণে,
অপদার্থ ছিন্নলতা-প্রায়।
দলিত ব্যথিত প্রাণ,
পায় নাই প্রতিদান,
সব ভুলে তাই আছে পড়ে;
তোমাদের কোলাহল,
করে সদা হীনবল,
থর থরি কাঁপে ভয়-ডরে।
সরল বিশ্বাস-ভরে
পরকে আপন করে'
তোমরা গো চলেছ উল্লাসে;
চারি দিকে ধায় প্রাণ,
সব কাজে আগুয়ান,
শোক-দুঃখ পলায় তরাসে।
ভবিষ্যের শূন্য পথে,

চলিয়া মানস-রথে,
তাতেও করিছ কত খেলা ;
বাধা-বিঘ্ন যত হায়,
পিছনে থাকিয়া যায়,
অন্ধকারে মিশে দুঃখ-জ্বালা।
তোদের মঙ্গলতরে,
সবাই ঘুরিয়া মরে,
মোর কাছে কেন মিছে আসা ?
হয়েছি চক্ষের শূল,
অভাগার সমতুল,
জগৎ করেনা কভু আশা।
স্বার্থপর জগতের,
সকলি নূতন ফের,
সুখ দিলে দুঃখ দেয় হেসে ;
মরিলে পরের তরে,
সে হাসে পিছন ফিরে,
বুকে ছুরি দেয় ভালবেসে।
এ মরুহৃদয়-ভূমে
মন্দাকিনী যেত চুমে,
এক দিন এরো ছিল সব ;
এও তোমাদের মত,
উৎসাহে নাচিত কত,

ভরা ছিল আনন্দ-উৎসব।
পরকে আপন করা,
বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা,
একদিন জানিত সকলি :
কাঁদিত পরের দুঃখে,
হাসিত পরের সুখে,
প্রতিদান পায়নি কেবলি।
যুঝে যুঝে তনু ক্ষীণ,
হৃদয়ের বলহীন,
অবসর লইয়াছি তাই ;
সবাই ঠেলেছে পায়,
বিদায় দিয়েছে হায়,
জ্বলন্ত এ বিষম বালাই।
তাই এ নির্জ্জন পুরে,
শতেক যোজন দূরে,
পড়ে আছি ভগ্ন প্রাণ নিয়ে :
অতীত সুখের স্মৃতি,
গায়না মধুর গীতি,
অলীক-স্বপন-সুখ দিয়ে।
আজি কে কেনগো তোরা,
(সুখ-হৃদি সুখে ভরা !)
এলি পুন জাগাতে হেথায় ?

মিনতি তোদের ঠাঁই,
ও সুখে গো কাজ নাই,
ভুলে আছি ডেকোনা আমায়।

কার্ত্তিক—১৩০৪। শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

বালক-বালিকা।

১
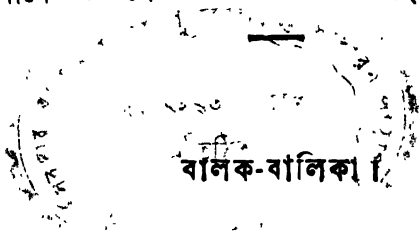
তটিনীর কূলে, উপবন এক,—
ফুলগাছ সারি সারি ;
মালতী, মল্লিকা, বেল, যুঁই ফুটি',—
কি শোভা হয়েছে মরি!

২

মৃদুল-মধুর, মলয়-অনিল,—
ঝিরি ঝিরি বহে যায় ;
শিহরিয়া উঠে', তরু-সহ লতা,
ঈষৎ কম্পিত কায়।

৩

পশ্চিম-গগন, লোহিত বরণ,
সান্ধ্য-রবির আভায় ;

তটিনী-উপরে, প্রতিবিম্ব তার,
নয়ন-মন ভুলায়।

৪

নীরব চৌদিক ; স্রোতস্বতী ধীরে
কুল-কুল রব করি',
সাগর-উদ্দেশে অবিরত ধায়,
বীচিমালা বুকে ধরি'।

৫

উপবন-মাঝে, দুইটী কেবল,
বালক-বালিকা খেলে,
আনি' নদীজল, ক্ষুদ্র জলাধারে
ছিটাইছে আলবালে।

৬

আলবালে সব জলসেক করি',
ফুটন্ত কুসুমাশায়,
কুঞ্জের চৌদিকে দোঁহে মিলি' ভ্রমে
বনদেবদেবীপ্রায়।

৭

সযতনে তুলি' নানা জাতি ফুল
বসি' দুটী পাশাপাশি,
গাঁথিতে লাগিলা মালা সুচিকণ
লয়ে ফুল্ল ফুলরাশি।

৮

কুসুম-কোমল, কমনীয় কর,
প্রফুল্ল প্রসূনে ঢাকা,
পূর্ণিমা নিশীথে কুমুদিনী যেন,
চাঁদের কৌমুদী মাখা।

৯

প্রাণহীন ওই নিকুঞ্জ উপরি,
কতফুল শোভে ফুটি,
কুঞ্জমাঝে যেন রহেছে ফুটিয়া
জীবন্ত কুসুম দুটি।

১০

একে একে যত তারা গুলি উঠি',
চা'হিছে ধরার পানে;
বেলা বয়ে গেল ঘিরি'ছে আঁধার
এরা দুটী নাহি জানে।

১১

অকস্মাৎ যেন, নিদ্রা হতে উঠি',
পার্শ্বেতে চাহিলা বালা;
কোমল দৃষ্টিতে বালকে নেহারি';
পরাইল ফুলমালা।

১২

কি জানি কেমন আবেশ-বিহ্বল,—
বালক দুইটী করে,

স্ব-গ্রথিত হার বালিকা-গলায়
পরাইল প্রীতি-ভরে।

১৩

আকাশে হাসিছে তারকার দল
নিচে নদী কুলু গায়।
হাতে হাতে ধরি' বালক-বালিকা
আপনার ঘরে যায়।

অগ্রহায়ণ—১৩০৪। শ্রীঅধরকৃষ্ণ বসু।

বুঝাও আমায়।

১

সংশয়ের মাঝে পড়ি', ডাকিছে তোমায়, প্রভু,
বুঝাতে আমারে ;
কোন পথ ধরি' আমি চলিলে সতত, দেব,
পাইব তোমারে!

২

কি যে সত্য—কি যে মিথ্যা, চাহিনা বুঝিতে- চাহি
পথ চিনিবারে!
অজ্ঞান-তিমির মাঝে, ধীরে ধীরে যেতে চাই,
পাইতে তোমারে!

৩

সতত আমার মন, বুঝিতে পারে না, নাথ,
মহিমা তোমার!
তাই সংশয়ের মাঝে, ডাকিছে আকুল প্রাণে—
এস একবার!

৪

ভয়ের সাগর হ'তে, তরাও কিঙ্করে, বিভু,
ভয়েতে কাতর!
নয়ন-যুগল মম, রবে কিগো চির অন্ধ,
নিখিল-নির্ভর?

৫

দৈনিক জীবন মম, কর সমুজ্জ্বল, দেব,
দিবালোক সম;
পবিত্র নির্ম্মল কর জীবনের প্রতি অঙ্ক
ঘুচাও হে ভ্রম!

৬

মুছে দাও শোক তাপ,— ভুলি সব যেন, নাথ,
তব আরাধনে!
নশ্বর জীবন মম, ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুখ,
ঘুচিবে দর্শনে!

অগ্রহায়ণ—১৩০৪। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরাশ-প্রণয়।

শ্রীচরণ-মূলে তা'র প্রীতিভরে উপহার
দিনু মম জীবন-যৌবন :
কি কব দুখের কথা— কহিতে পাইনো ব্যথা—
উপেখিল নিরদয় জন !
দলিয়া অভাগী হিয়া, চিরতরে তেয়াগিয়া,
নিঠুর সে যাইল চলিয়া :
বারেক হেরিল না সে কত তা'রে ভালবাসে
দাসী তার তনু-মন দিয়া !
গেঁথেছিনু ফুলহার পরাইতে গলে তা'র,
হের সখি ! যায় শুকাইয়া
শুকাইল ফুলমালা,— শুকায় না—একি জ্বালা –
উপেখিত, বিদলিত হিয়া !

ভাদ্র—১৩০৪। শ্রী——

শিকার ।

(সনেট্ ।)

মেরোনা-মেরোনা ভাই ! ওই তীক্ষ্ণ শর :
বড় ব্যথা বেজে উঠে প্রাণে ; করিওনা—
করিওনা—ক্ষুদ্র বক্ষ বেদনা-কাতর !
এক বিন্দু জীব-রক্তে মেখোনা মেখোনা
অনন্ত-কলুষ-পঙ্ক, হৃদয়-ভিতর !
ত্যজ ভাই ! এ কঠিন শর পিপাসিত :
প্রেম-চাপে জ্ঞান-শর করি' সংযোজিত,
উঠ ভাই ! দূরে ওই মহত্ত্ব-শিখর !
অগণন পশু পূর্ণ সংসার-কান্তার !
চল যাই উহাদের করিতে শিকার !
স্নেহ-পাশে সকলেরে করিয়া বন্ধন,
জ্ঞান-বাণে করি' বিদ্ধ হৃদয় সবার,
পশুত্ব ঘুচায়ে দেই মনুষ্য-জীবন !
চল ভাই ! চল যাই করিগে শিকার !

বৈশাখ—১৩০৫ । যতীশ ।

বিষয়ানুরাগ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে 'বিষয়' বলা যায়। ইহাই বিষয়ের প্রকৃত অর্থ। যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, যাহার গন্ধগ্রহণ করিতেছি, যাহার রসাস্বাদন করিতেছি, যাহা স্পর্শ করিতেছি এই সকলই বিষয়। একটী দৃশ্য, একটী শব্দ, একটী সুগন্ধ, একটী উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য, সুখ-স্পর্শ-শয্যা এগুলি সকলই বিষয়। ইন্দ্রিয়-গোচর যাবতীয় পদার্থই বিষয়; অতএব পার্থিব সমস্ত বস্তুই 'বিষয়'। আমরা এই বিষয়ের মধ্যগত,—এই বিষয় সাগরে নিমজ্জমান; আমরা সহজে উহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারি না, অর্থাৎ উহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। যেমন মীন জল না হইলে থাকিতে পারে না, তেমনি প্রাকৃত জীব বিষয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। যেমন বিষকীটের বিষ অধিষ্ঠান, তদ্রূপ সাধারণ সংসারী ব্যক্তির বিষয়ই গ্রাহ্য, বিষয়ই সেব্য, বিষয়ই উপাস্য। সামান্যতঃ সংসারী লোকে ধনাদি ঐশ্বর্য্যকে বিষয় বলিয়া থাকে; তাহার কারণ ধনদ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখকর সকল বস্তুরই সমাবেশ হইতে পারে; এই কারণ ধন বিষয়-পদবাচ্য। যিনি অনেক ধনের অধিকারী, ও ধন-রক্ষা করিতে সমর্থ,—তিনি বিষয়ী, তাঁহার বিষয়-জ্ঞান আছে। যদি দয়াশীলতা প্রযুক্ত স্বোপার্জ্জিত সামান্য অর্থদ্বারা সাধা

অতিক্রম করিয়াও পরোপকার করেন, তাহার বিষয় জ্ঞান নাই, তিনি জগতের নিকট নিন্দার্হ।

এই বিষয়ানুরাগ সমস্ত জগতকে আকৃষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। এই প্রপঞ্চ সংসার-ক্ষেত্রে মায়া-দেবী আপনার বিষয়রূপ ইন্দ্রজাল বিস্তৃত করিয়া জীবকে পাশ-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, জীবের নিস্তারের পন্থা আর দৃশ্যমান হইতেছে না। কোথাও দেখুন, দীন কৃষক গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-দগ্ধ হইয়াও ভূমি-কর্ষণাদি কার্য্যে তৎপর রহিয়াছে, কোথাও ধীবর জল-নিমজ্জিত হইয়া মৎস্য ধারণ জন্য আপনার জাল বিস্তার করিতেছে, আবার কোথাও বা গভীর জলধি-জলে ভাসমান অর্ণবপোতের উপর উচ্চ মাস্তলে উঠিয়া পোতের দরিদ্র কর্ম্মচারী পতাকা রজ্জু সংলগ্ন করিতেছে; আহা! যদি সেই ব্যক্তি সেই উচ্চ প্রদেশ হইতে পতিত হয়,—তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতল-স্পর্শ জলের নীচে মুক্তা আহরণজন্য নিমজ্জনকারী কাচময় গৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলে নিমজ্জিত হইতেছে; ব্যাধেরা শর বন্দুকাদি শস্ত্র-প্রয়োগ-দ্বারা শ্বাপদ মৃগাদি হননের জন্য দুর্গম বনে ভয়াবহ ব্যসনে নিযুক্ত হইতেছে। দস্যু ও চোরেরা মনুষ্যের ধন-প্রাণ নষ্ট করিবার অভিলাষে দুষ্কর পাপ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। আবার দেখুন, যাহারা সন্ন্যাসীর ভাণ করিয়া লোককে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য

অঙ্গে বিভূতি-বিলেপন, ত্রিশূল ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন, তাহারা কি ভয়ানক লোক।

পাঠকগণ, আপনারা স্থির জানিবেন এ সকল ব্যক্তির ধর্ম্মজ্ঞান আদৌ নাই, ইহারা মূর্ত্তিমান প্রতারণা, ইহাদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। ইহারা মেষ-চর্ম্মাবৃত শার্দ্দুল। এই বিষয়ের সেবায় নিযুক্ত হইয়া এমন কার্য্য নাই যাহা মনুষ্য করে না। এই বিষয় জীবের সদ্গতির প্রতিরোধক,—কিন্তু ইহাতে আমরা কোন ক্রমেই বীতরাগ হইতে পারি না। বিষয়-প্রসঙ্গ ব্যতীত কোন প্রসঙ্গই আমাদের উপাদেয় হয় না। ধনের কথা, ধনবানের কথা, অলঙ্কারাদি, গৃহ, উপবন, নাট্য, গীত, বাদ্য,—বৃথা ক্রীড়াদি ইন্দ্রিয় সুখকর সকল বস্তুই আমাদের উপাস্য। জগতের সমস্ত জীব এই বিষয়ে বিমুগ্ধ,—অধিকন্তু মানব বিবেকের অধিকারী হইয়াও এই অনিত্য বিষয়সুখে অনুরক্ত,—আজীবন বিষয়ের আলোচনায় অতিবাহিত করিতেছেন। কোনও বস্তুর আবশ্যকতা দেখিতে পাইতেছি। যখন চিত্ত, সংসার দাবানলে দগ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে শান্তি-সরোবরের দিকে ধাবিত হয়,—তখন বিলক্ষণ বোধ হইতেছে আমাদের জুড়াইবার কোন স্থান আছে। যখন কোনও শুভক্ষণে চকিতের ন্যায় চিত্ত সাংসারিক সকল চিন্তা হইতে অবসৃত হইয়া একবার সেই প্রভুর ভাবনায় নিমগ্ন হয়,—তখনকার সেই অনির্ব্বচনীয় ভাবটী একবার হৃদয়ঙ্গম করুন দেখি?

পাঠকগণ, বোধ হয় আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কঠিন পীড়া-গ্রস্ত কোন জ্বর-রোগী পিপাসা, দাহ, বেদনায় শয্যার উপর নিরন্তর ছট্‌-ফট্‌ করিতে করিতে এক একবার নিস্তব্ধ হইয়া থাকে, তখন সে অন্তরে কিছু সুখদৃশ্য দেখে,—সেই ব্যবধান কালের মত,—আমাদের আত্ম-বোধ হয়, ও সেই ক্ষণিক আনন্দ আমরা লাভ করিয়া থাকি। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, মানব-জন্ম অতি দুর্ল্লভ জন্ম;—কারণ মানবকে বিবেক-শক্তি দেওয়া হইয়াছে,—এই বিবেকের প্রভাবে মানব সদসৎ বিচারে সক্ষম,—ইতর প্রাণীদিগের সে ক্ষমতা নাই। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, চতুরশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মানব-জন্ম প্রাপ্ত হয়। এই মানব-শরীর ধারণ করিয়া যদি আমরা কেবল আহার, নিদ্রা ভয়াদির বশীভূত হইলাম, আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করিলাম না, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিলাম না, পরলোকের উপায় করিলাম না,—তবে আমরা নিশ্চয়ই মানব নামের অযোগ্য।

ঈশ্বর মানব-অন্তরে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহার উৎকর্ষ-সাধনদ্বারা যাহাতে আত্মজ্ঞান হয়, তাহাই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য।

"বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মনি কোঽপি নলগ্নঃ॥"

বাল্যকালে ক্রীড়াসক্তি, যৌবনে ইন্দ্রিয়াসক্তি, বার্দ্ধক্যে চিন্তা (দুশ্চিন্তা); আমাদের কোন কালেই ঈশ্বর-প্রসঙ্গ নাই। এস্থলে বিবেচ্য এই, যদি বিষয় আমাদিগকে যথার্থ সুখপ্রদানে অসমর্থ,—তবে বিষয়ের জন্য কেন এই মহামূল্য মানব-জীবন বৃথা অতিবাহিত করি। যদি এই বিষয় ব্যতীত এমন কোনও বস্তু থাকে যাহা আমাদের নিত্য আনন্দ প্রদান করিতে পারে,—তাহা হইলে তাহার অনুসন্ধান করা কি কর্ত্তব্য নহে? তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—যে জড় বিষয়ের অতিরিক্ত আরও কোন বস্তু আছে, যাহার সম্যক জ্ঞান হইলে আমাদের প্রার্থনা, আশা, অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়; যাহা প্রাপ্ত হইলে আমাদের আর কোনও অভাব থাকে না,—যাহা লাভ করিলে আমরা অতুল আনন্দের অধিকারী হইতে পারি,—যাহা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। যখন বিষয়-রসে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন এমন কোনও পানীয় আবশ্যক যাহাতে আমাদের দুর্ব্বিসহ তৃষ্ণার অন্ত হয়। যখন সুভক্ষ্য, পানীয়, বসন, ভূষণ, সুখস্পর্শ শয্যা, বাস, উপবন, কিছুতেই সুখ দিতে পারে না, যখন ধন পিপাসার নিবৃত্তি নাই,—যখন সংসার ভয়, রোগ, শোক, অভাব ও দারিদ্র্যের আস্পদ, তখন নিত্য সুখ-শান্তির কারণ আত্মজ্ঞান জন্মিলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না।

বিষয় জনিত সুখ অস্থায়ী, এই সুখের পরিণাম দুঃখ। কোন ভাবুক বিষয়-সম্বন্ধে বলিয়াছেন :——

"বিষয়ের দুঃখ নানা
বিষয়ীর উপাসনা
ছাড় মন এ যন্ত্রণা
সত্যভাব মনে॥"

এই বিষয়ের সেবায় আমাদের জীবন অতিকষ্টে অতিবাহিত হইতেছে, সংসার-রূপ নাট্যশালায় দারা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, প্রভু, ভৃত্য-রূপ অভিনেতাগণ আপন আপন কার্য্য করিতেছে, পুনরায় চলিয়া যাইতেছে ; তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের প্রণয়ভাজন হইতেছে, অতএব তাহাদের নিষ্ক্রমনে আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়া থাকি।

সংসারে অদ্য মহোল্লাস, কল্য হাহাকার, অদ্য পুত্রের মুখ-চন্দ্রমা দেখিয়া হর্ষে পুলকিত,—কল্য তাহার মৃত শরীরের উপর অশ্রু-বিসর্জ্জন। এস্থলে বিষয়-ব্যাপারের একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের দেশে দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে,—এবং একদিন বা তিনদিন পরে পুনরায় জাহ্নবী-নীরে বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে,—ইহার গূঢ় রহস্য কি,—এমন যে দৈবী মূর্ত্তি, যাহাকে এত সমাদর করিয়া আনয়ন করিলাম, এবং ষোড়শোপচারে যাহার পূজা করিলাম, যে উপলক্ষে কত দান, ধ্যান, "দীয়তাং ভূজ্যতাং" হইয়া গেল,

সেই মনোহর মূর্ত্তি পরদিবস জলে বিসর্জ্জিত হইল। আমাদেরও গতি সেইরূপ। যে কৃতী পুরুষ জীবদ্দশায় অনেক উপার্জ্জন করিয়াছেন, অনেককে অন্ন-বস্ত্র দিয়াছেন, অনেকের সেবা ও পূজা গ্রহণ করিয়াছেন, মৃত্যুকালে তিনি কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় পরিত্যক্ত হয়েন। আবার দেখুন,— কোনও ধনীব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার দান-পত্র (উইল) হইয়া থাকে, অনেকে তাঁহার প্রসাদের ভিখারী হইয়া তাঁহার শেষ শয্যার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। যে যেরূপে পারে তাঁহার ধনরত্নাদি গ্রহণ করে। এই অদ্ভুত বিষয়ানুরাগ নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা চৈতন্য-বিহীন হইয়া বিচরণ করিতেছি। কোন কবি গাহিয়াছেন :—

যাদের চাহিয়ে ভুলেছি তোমারে
তারা'ত চাহে না আমারে
তা'রা আসে, তা'রা চলে যায়
ফেলে যায় দূরে, মরু-মাঝারে
দুদিনের হাসি, দুদিনে ফুরায়
দীপ নিবে যায় আঁধারে
কে রহে তখন, মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে॥

কবি কি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন! আমাদের কেবল বৃথা অশ্রু-বিসর্জ্জন। পৃথিবীতে কেহই নাই, বৃথা মায়ায় বদ্ধ হইয়া আমরা অনিত্য অসত্য বস্তুর উপর

প্রীতিস্থাপন করিয়া, পরমধন জীবন-সখাকে ভুলিয়া রহিয়াছি।

জগতের নিত্য ব্যাপার অবলোকন ও পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয় জানিতে পারা যায়,—যে বিষয়-সুখ অনিত্য, কেবল দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়,—ইন্দ্রিয়জনিত সুখ ক্ষণিক। নিরন্তর কোন সুন্দর বস্তু দেখিতে দেখিতে তাহার উপর বীতরাগ হইতে হয়; নিরন্তর সুশ্রাব্য শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে তাহা আর ভাল লাগে না, নিয়ত সুগন্ধ ঘ্রাণ করিতে করিতে তাহাতেও অনাসক্তি উপস্থিত হয়, অবিরত সুখাদ্য ভক্ষণেও তৃপ্তি-দান করিতে পারে না। নানাবিধ সুখ-স্পর্শ দ্রব্যাদি সেবনেও আনন্দ উৎপাদিত হয় না। এ সকল নিত্য উপভোগ্য সামগ্রী ও নিত্য ঘটনা উপভোক্তার স্থায়ী সুখ উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু ইহার ভিতর একটী গূঢ় রহস্য আছে। যদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা এবং তত্তৎ গ্রাহ্য পদার্থাদির বিশেষ বিশেষ গুণ-গ্রামে আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ করিতে পারি তাহা হইলে আমরা চরিতার্থ হইয়া যাই। যদি প্রত্যেক সুন্দর পদার্থ অবলোকন করিলে সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রভুর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলেই আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইল।

আবার সেই দর্শন শক্তি, যাহার প্রভাবে আমি সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিতে পারি, সেই অমোঘ

শক্তি কাহার? সেই শক্তি কোথা হইতে পাইলাম, সেই শক্তিই বা কি? তাহাতে কি তিনি নাই? অন্ধ ব্যক্তিই জানিতে পারে, যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ভাগ্য তাহা অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এমন কি শক্তি আছে, যদ্দ্বারা আমরা সুগন্ধের জ্ঞানলাভ করিতে পারি, ও ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধের পৃথক ভাব অনুভব করিতে পারি। ইন্দ্রিয়গণের এই বিচিত্র শক্তি মধ্যে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের নিখিল গুণগ্রামের মধ্যে সেই সর্ব্বশক্তিমান গুণাধারের শক্তি ও গুণের উপলব্ধি করিতে পারি। যখন বুঝিতে পারি, যে পরমপিতা পরমেশ্বর এই ইন্দ্রিয়গণকে তাঁহাকে জানিবার জন্য, তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত, নিয়োজিত করিয়াছেন তখনই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয়। ইন্দ্রিয়গণ কেবল নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য প্রদত্ত হয় নাই, তাহাদের উচ্চতর প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার শব্দের বিচিত্র ক্ষমতা দেখুন। শব্দের মধ্যে যে মনোহারিত্ব আছে তাহা সম্যক অনুধাবনে হৃদয় প্রেমানন্দে ভাসমান হয়। কোন শব্দে করুণরস, কোন শব্দে প্রেমরস, কোন শব্দে শান্তিরস, কোন শব্দ শ্রবণ করিলে চিত্ত স্ফূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হয়, কোনও শব্দে গভীর ভাবের আবির্ভাব হয়, শব্দবিশেষে দুঃখ ও শোকের ভাব প্রকাশ করে, কোনও শব্দে বীরভাবের আবেশ হয়, কোনও শব্দে হাস্যরসের প্রকাশ করে, কোনও বিকট শব্দে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়, কোনও স্বরে তীব্র বৈরাগ্য

অনুসূচিত হয়। এই শব্দ-বৈচিত্রের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়। যাঁহারা বেদের স্তোত্রাদি কর্ণগোচর করিয়াছেন, তাঁহারাই শব্দের মাহাত্ম্য জানেন। উদাত্ত, অনুদাত্ত সরিতের সমাবেশে পঠিত বেদগান শ্রবণে হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয় ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সুর-যন্ত্রের তারে আঘাত করিবা মাত্রই যে সুর উত্থিত হয়,—তাহার মিষ্টতা অন্তরে অনুভূত হয়। সুরজ্ঞ মনীষিগণ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ, সন্ধ্যা, অর্দ্ধরাত্রি, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, উষা প্রভৃতি কালের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তত্তৎ সময়োপযোগী সুরের সৃষ্টি করিয়াছেন ;—সেই সেই কালোপযোগী নির্দ্দিষ্ট রাগরাগিণী উদ্গীত হইলে কালের সহিত শব্দের বিচিত্র ঐক্য পরিদৃশ্যমান হয়। শব্দকে শাস্ত্রে "ব্রহ্ম" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছে। ভক্তবীরগণের হৃদয়োন্মাদকারী ভক্তিগীত শ্রবণে কোন্ পাষাণ-হৃদয় না দ্রবীভূত হয়? অতএব দেখুন এই শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-প্রকৃত কার্য্য—করিতে পারিলে আমরা কি কৃতার্থ হই না?

রসনা রসগ্রহণে তৎপর, রসনা সুরসআস্বাদনে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, কুরসগ্রহণে আনন্দ লাভ করে না।

যখন রসনা ভিন্ন ভিন্ন সুরসআস্বাদনে আনন্দ-অনুভব করিতে থাকে, তখন কি চিত্ত, সেই রসনার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? শ্রুতিতে সেই পরমাত্মাকে রসস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে,—'রসোবৈসঃ' তিনি

রস-স্বরূপ। অতএব রস-গ্রহণ-ক্রিয়াতেও তাঁহাকে জানিতে পারি। রূপজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, রসজ্ঞান :—তথা ঘ্রাণ ও স্পর্শে ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে বিদ্যমান দেখিতে পায়।

যদি মানব ইতর প্রাণীর ন্যায় ইন্দ্রিয়দ্বারা জড়পদার্থের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসাস্বাদন ও স্পর্শমাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে—যদি রূপদর্শনে, গন্ধগ্রহণে, শব্দশ্রবণে, রসাস্বাদনে ও স্পর্শজ্ঞানে সেই পরমপিতার চিন্তনে ও ধ্যানদ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হয়—তবে সে মানব, মানব-পদবাচ্য নহে।

যখন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য আমরা বিবেক-প্রবুদ্ধ হইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, যখন রূপদর্শনার্থে কামপ্রমুগ্ধ হইয়া মূর্ত্তিদর্শন না বুঝাইবে, যখন সঙ্গীত শ্রবণে হৃদয়ে কুৎসিত ভাবের উদ্দীপন না করিবে, যখন আঘ্রাণের প্রত্যেক ক্রিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে, অথচ পাশব বৃত্তির উত্তেজক হইবে না, যখন সুরস আস্বাদনে চিত্ত কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হইবে, কিন্তু দুষ্প্রবৃত্তির প্রশয়কারী হইবে না, যখন সুখস্পর্শে প্রভুর পাদস্পর্শ অনুভব করিবে তখনই ইন্দ্রিয়গণ সংস্কৃত হইল মনে করা উচিত। যখন ইন্দ্রিয়গণ এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে অভ্যস্ত হইবে, তখন তাহারা আর উন্মার্গগামী হইতে ইচ্ছা করিবে না. তখন প্রত্যেক পদস্খলনে অনুতাপ ও দুঃখ-শোকের আবির্ভাব হইবে, তখন পাষাণ-হৃদয় ক্রমশঃ কোমলতর—কোমলতম হইতে

থাকিবে; তখন চক্ষু কেবল প্রকৃতির প্রেমচ্ছবি দেখিয়া অনন্ত প্রেমে মুগ্ধ হইবে, কর্ণ কেবল সাত্বিক প্রেমব্যঞ্জক স্বরে আকৃষ্ট হইবে, নাসিকা বিবিধ প্রসূনের অনির্ব্বচনীয় গন্ধসুধাগ্রহণে লোলুপ হইবে, রসনা কেবল বিশুদ্ধ নির্ম্মল ফলমূলাদি সাত্বিক পদার্থের রসগ্রহণে অভিলাষী হইবে, তখন সমীরণবীজন ও সামান্য তৃণ শয্যাতেও সুখানুভব হইবে, সুকোমল শয্যার আবশ্যকতা থাকিবে না।

উক্ত কারণাদি বশতঃ কপটতাহীন, সরলান্তকরণ-বিশিষ্ট, সাধুগণ, ভগবৎভক্তগণ, ঈশ্বর-বিশ্বাসী মহাত্মাগণ নির্জ্জনে বাস করিয়া থাকেন। যেথানে বিষয়ের কোলা-হল নাই, বিষয়ীর দম্ভ নাই, পাপীর আর্ত্তনাদ নাই, প্রলো-ভনের সামগ্রী নাই এমন প্রকৃতির শোভা বিন্যস্ত রমণীয় স্থানে বাস করিয়া থাকেন।

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দ জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোহনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে
গুহা নিবাতাশ্রয়েণ প্রয়োজয়েৎ॥"

কঙ্কর-শূন্য, তপ্ত বালুকা-বর্জ্জিত, সমান ও শুচিদেশেঃ, উত্তমজল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে, প্রতিবাদীর অনভিমুখে ও সুন্দর বায়ু সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক। ইন্দ্রিয়গণকে এই প্রকার অনিত্য বিষয়ের সেবা হইতে প্রতিনিবৃত্তি

করিয়া পরম পিতার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে আমরা প্রকৃত কার্য্যকুশল হইলাম। প্রকৃতির শোভা-সন্দর্শন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমরূপ হৃদয়পটে অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদের চক্ষু দিয়াছেন; মনোমুগ্ধকর শব্দ শুনিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার জন্য কর্ণ দিয়াছেন: সুন্দর ঘ্রাণ-গ্রহণ করিয়া তাঁহার মহিমা চিন্তা করিবার জন্য নাসিকা দিয়াছেন; বিবিধ বিচিত্র ফল, মূল, মিষ্টান্নাদি আস্বাদন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার জন্য জিহ্বা দিয়াছেন; বিশুদ্ধ সমীরণ সেবন, পবিত্র জলে স্নান, চন্দনাদি সুগন্ধলেপন ও পুষ্পাদি চয়ন করিবার জন্য ত্বক দিয়াছেন; কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন, দানাদি সৎক্রিয়া করিবার জন্য হস্ত দিয়াছেন। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদের অধিপতি মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে আমাদের জীবন সফল হইবে।

এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সকল বিষয়ে তাঁহার সত্বার উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরা চরিতার্থ হইয়া যাই, আমাদের বলবতী তৃষা দূর হইয়া যায়,—নতুবা "বিষয় বাড়িবে যত, বাসনা বাড়িবে তত"। আমি যতই কাম্য বস্তু লাভ করি, ততই আমাদের বিবিধ কাম্য বস্তুর অভিলাষ বাড়িতে থাকে,——রাজা যযাতি স্বয়ং বলিয়াছেন;——

"নজাতুকামঃ কামনানুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ন ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

কাম্য বস্তুর ভোগে কামনার শান্তি হয় না, পরন্তু অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই বিষয়ের প্রতি বীতরাগ হইবার উপায় নিয়ত বিষয়ের অনিত্যতা চিন্তন, পৃথিবীর প্রত্যেক ঘটনার পার্থিব বস্তুর বিনশ্বরত্ব পর্য্যালোচন; এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে মানব দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হইতে সক্ষম হয়। নিয়তঃ তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা উচিত, "প্রভু আমাকে রক্ষা কর," "প্রভু আমাকে বিনাশ করিওনা", "মা মা হিংসী"। আমাদের জীবনের এই বিষম পরীক্ষা। আমরা বিষয়ের সুন্দর মোহকর মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া পরলোকের কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, আমরা জগতের জীবের বিবিধ শাস্তি দেখিতেছি, আমরা রোগের প্রকোপ, শোকের প্রতাপ, জরার প্রভাব ও মৃত্যুর শাসন দেখিয়াও উদাসীন। বিষয়-সুখে অন্ধ হইয়া নিয়ত অজ্ঞান-পথে বিচরণ করিতেছি। পতঙ্গ যেমন রূপে মুগ্ধ হইয়া দীপ-শিখাতে পতিত হয়, তদ্রূপ আমরা জলন্ত দীপ-শিখায় পতিত হইয়া মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। এই বিষয়-বাসনারূপ কঠিন রোগের শান্তিস্বরূপ আমরা "হরিনাম" ব্যতীত আর অন্য ঔষধি দেখিতে পাইতেছিনা। আমরা যাবজ্জীবন বিভুগান করিতে করিতে যেন নিত্যধামে যাইতে পারি—এই আমা-

দের একান্ত বাসনা। পাঠকগণ আসুন আমরা সকলে সমস্বরে বলি——

"ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম
অস্তদেকং জগৎসাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥"

ফাল্গুন; চৈত্র; বৈশাখ—১৩০৪; ১৩০৫।

শ্রীপুলিন বিহারী সেন গুপ্ত।

পথহারা।

হারায়ে ফেলেছি যেগো আমার সে চেনা পথ,
তরু, লতা, ফুল, পাতা, ভ্রমরার সুধারব ;
কোকিলের কুহুস্বর কই সে নিকুঞ্জবনে !
তটিনীর কুলু কুলু গায়নাত' তা'রি সনে ;
মলয় ত' ফুল চুমি' ছড়ায় না মধু-বাস,
কামিনীর কণ্ঠ হ'তে উঠেনা সরাগ হাস।
আকাশে তারকা গুলি ফোটে নাত' একে একে
জ্যোছনা অলসে কই ঘুমায় সরসী-বুকে ?
বকুলের আড়ে কই কচি সেই মুখখানি ?
রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু বাজেনা নুপুর-ধ্বনি ;
সারা বন তা'র সাথে নাচেনা ত' তালে তালে ;
শ্যামা, পিক্, শুক, সারি গায়না ত' ডালে ডালে।
এ কোন নূতন দেশে এলে তুমি পথ ভুলে ?
দিশে-হারা আঁখিতারা চাহেনা ত' মুখতুলে !
বিষাদ মাখান এযে সকলই বিমলিন :
হাসি, অশ্রু নাহি হেথা সবাই কি প্রাণহীন ?
এই কি জগৎ-সীমা—সুখের সমধিস্থল ?
হেথা কি পশে না কভু সংসারের কোলাহল ?
কেমনে নির্জ্জন পুরে হেথায় রহেগো এরা ?

কায নাই, চল যাই, যেথায় রয়েছে তা'রা ;
চল ফিরে শ্রান্ত মন শান্তিময় সেই দেশে,
জুড়াবে সকল জ্বালা তা'র শ্যাম ছা'য় বসে।
না হেরে তোমারে সেথা হয়েছে পাগল-পারা :
কেমনে কি গ্রহফেরেহলে তুমি পথহারা ?

আশ্বিন—১৩০৪। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রতিশোধ।

[১]

শিবরাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা শান্তি সুবিখ্যাতা সুন্দরী। শুধু নিজগ্রামে নহে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহেও শান্তির রূপ-খ্যাতি বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। শান্তির বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। শান্তির বয়ক্রম প্রায় চৌদ্দ বৎসর। তাহার পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া শান্তির এখনও বিবাহ হয় নাই। শান্তির পিতা প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন : কিন্তু তাঁহার মনে সুখ ছিলনা, কারণ তিনি কয়েক বৎসর হইল উপর্য্যুপরি শোকাঘাতে বিকলচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শান্তিই এখন শিবরাম বাবুর একমাত্র সান্ত্বনাদায়িনী ছিল। সেই জন্যই এতদিন শিবরামবাবু প্রাণ ধরিয়া শান্তির বিবাহ দিতে পারেন নাই। যদিও দরিদ্রের পক্ষে ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা অনূঢ়া থাকা দোষাবহ বলিয়া সমাজে পরিগণিত হয়, কিন্তু ধনশালী শিবরাম ভট্টাচার্য্যের এই কার্য্য কেহ অন্যায় বলিয়া প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই।

[২]

দেখিতে দেখিতে একবৎসর অতীত হইল, শিবরাম বাবু শান্তির বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইল না। কারণ তাঁহার কন্যা সুন্দরী এবং প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকারিণী; সুতরাং অনেকেই শান্তির পাণি-প্রার্থী হইলেন। দলে দলে ঘটকগণ সম্বন্ধ লইয়া শিবরাম-বাবুর বাটীতে আসিতে লাগিল। শিবরাম-বাবু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নন্দনপুরের রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কমল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। অন্যান্য ঘটকবৃন্দ মলিন মুখে বিদায় লইল। রত্নেশ্বর বাবু ও তাঁহার পরম সুহৃদ্ রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া কন্যা দেখিয়া গেলেন। কন্যা উভয়েরই অত্যন্ত মনোনীত হইল। শীঘ্রই বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গেল।

[৩]

নন্দনপুর হইতে শিবরাম বাবুর বাটী প্রায় ১৬ ক্রোশ।

জলপথ ভিন্ন গমনাগমনের অন্য কোন পথ ছিলনা। রত্নেশ্বর-বাবুর বন্ধু রামেশ্বর-বাবুর বাটী নন্দনপুর হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে এবং শিবরাম-বাবুর বাটী হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরে। বিবাহের সময় রামেশ্বর বাবু বরযাত্র যাইবেন এবং তিনি তাঁহার বাটীর নিকট হইতে অন্য নৌকায় তথাকার অন্যান্য নিমন্ত্রিত বরযাত্রগণকে লইয়া একেবারে শিবরাম বাবুর বাটী উপস্থিত হইবেন—ইহাই স্থির হইল। একটী কথা পাঠকবর্গ জানিয়া রাখুন রামেশ্বর-বাবু নিজ পুত্রের সহিত শান্তির বিবাহ দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই।

[৪]

সমস্ত প্রস্তুত; গাত্র-হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে; বিবাহের আর দুই দিন আছে। এমন সময়, রত্নেশ্বর বাবু শিবরাম বাবুর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন যে শান্তির বড় জ্বর, অতএব বিবাহ দুই দিনের নিমিত্ত স্থগিত থাকুক। রত্নেশ্বর অগত্যা দুঃখিত চিত্তে তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং লোক পাঠাইয়া দূরস্থ বরযাত্রগণকে এ সংবাদ জানাইলেন। ভুলক্রমে তিনি রামেশ্বর বাবুকে জানাইতে ভুলিয়া গেলেন।

[৫]

অদ্য শিবরাম বাবুর বাটীতে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। হুলু ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শঙ্খধ্বনিতে জনকোলাহল মিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভূত ধ্বনি

উৎপাদন করিতেছে। অদ্য শান্তির বিবাহ। রাত্রি দেড়টার সময় লগ্ন। সন্ধ্যার সময় বর আসিবার কথা কিন্তু দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে রাত্র প্রায় ৮টা বাজিল কিন্তু তখনও বরের দেখা নাই। শিবরাম-বাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি একজন অশ্বারোহী পাইককে নদী-তীরে অগ্রসর হইয়া দেখিতে কহিলেন। সে প্রায় দুই ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত আসিয়া কাহারও কোনও নিদর্শন না পাইয়া ফিরিয়া গেল। শিবরাম বাবু নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে এ সংবাদ বাটীর ভিতর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া পড়িল। অন্তঃপুরিকাবর্গের মুখমণ্ডল প্রভাতের কুমুদিনীকুসুমবৎ ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিতে লাগিল। হর্ষ-কোলাহল ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়িল। সকলেই বিষণ্ণ ; এমন সময়ে, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বপুত্র ও কয়েকজন আত্মীয়-কুটুম্বের সহিত উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই মুখ পুনরায় প্রসন্ন হইল। সকলেই বরযাত্রের আগমনে বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে লগ্ন অতীত হইল। পুরোহিত অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া রাত্রি তিন প্রহরে একটী লগ্ন স্থির করিলেন। সকলের সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা মত হইল। শিবরাম বাবু জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে বড়ই ব্যাকুল হইলেন। পরিশেষে, রাত্রি যখন দুইটা বাজিল, তখন তিনি একেবারে বালকের ন্যায়

অধীর হইয়া পড়িলেন। রামেশ্বর-বাবু কহিলেন—"ভয় কি? যদি রত্নেশ্বর বাবু ছেলে না দেন তাহা হইলে এখন অন্য পাত্র দেখা যাক্। অন্য কেহ সম্মত না হন আমার পুত্র উপস্থিত আছে তাহার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন্।" শিবরাম বাবু ভাবনা-সাগরে কূল পাইলেন। ক্রমে লগ্নের সময় উপস্থিত হইল। কমলের পরিবর্ত্তে অমরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত শান্তির পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল।

[৬]

দুই দিন পরে রত্নেশ্বর বাবু পুত্রের বিবাহ দিতে আসিয়া শুনিলেন শান্তির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি শিবরাম বাবুকে অনেক কটূক্তি করিলেন। শিবরাম বাবু সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং কেবল মাত্র রত্নেশ্বর বাবুর দোষেই যে তিনি জাতিচ্যুত হইতে ছিলেন, তাহাও বলিতে বিস্মৃত হইলেন না। রত্নেশ্বর বাবু লিখিত পত্র দেখাইলেন। শিবরাম বাবু পত্রের কথা অস্বীকার করিলেন। গ্রামের সকলেই শিবরাম বাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিল। রত্নেশ্বর বাবু তখন নিজের মান রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া শিবরাম বাবুর শরণাপন্ন হইলেন। শিবরাম বাবু সেই রাত্রেই কোন এক প্রতিবাসীর সুন্দরী কন্যার সহিত কমলের বিবাহ-কার্য্য সমাধা করাইয়া রত্নেশ্বর-বাবুর মানরক্ষা করিলেন। রত্নেশ্বর

বাবুর বুঝিতে বাকী রহিলনা যে সে পত্র শিবরাম বাবুর লিখিত নহে। তিনি বেশ বুঝিলেন যে এই কার্য্য রামেশ্বর বাবুরই; তদবধি তিনি রামেশ্বর বাবুর মুখাবলোকন করিতেন না।

[৭]

দেখিতে দেখিতে উনবিংশ বৎসর কাটিল। ইতিমধ্যে শিবরাম বাবুর কাল হইয়াছে। শান্তি একটী কন্যা প্রসব করিয়াছে। তাহার বয়ক্রম এগার বৎসর এবং কমলেরও একটি পুত্র হইয়াছে তাহার বয়স ১৫ বৎসর। শিবরাম বাবুর মৃত্যুর পর রামেশ্বর বাবু অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি অহঙ্কারে লোকের সহিত বড় রূঢ় ব্যবহার করিতেন। অর্থের জন্য সকলে যদিও তাঁহাকে ভয় করিত কিন্তু মনে মনে সকলেই তাহার উপর বিরক্ত ছিল।

[৮]

রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি পৌত্রীর বিবাহ স্থির করিলেন। যাহার সহিত তাঁহার পৌত্রীর বিবাহের কথা ধার্য্য হইয়াছিল, তিনি রত্নেশ্বর বাবুর কোনও বিশেষ আত্মীয়ের পুত্র সুতরাং বলা বাহুল্য যে এ বিবাহে তিনি বরপক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বের ব্যাপার সমূহ স্মরণ করিয়া কোন মতেই রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটী যাইতে সম্মত হইলেন না কিন্তু অবশেষে

তিনি বর-পক্ষের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে স্বপুত্র-পৌত্রে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। যথা সময়ে তিনি বরযাত্রদিগের সঙ্গে রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে পঁহুছিলেন।

[৯]

লগ্নের কিছু বিলম্ব আছে এমন সময়ে বরযাত্রে কন্যা-যাত্রে বচসা আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ তাহা পরিপক্ক হইয়া কলহে পরিণত হইল। একটী বরযাত্র কন্যার বাটীর কোন স্ত্রীলোককে উপলক্ষ করিয়া উপহাস করাতে এই বিবাদের সূত্রপাত হয়। রামেশ্বর-বাবুর প্রকৃতি স্বভাবতঃই একটু উগ্র তাহার উপর তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণ রূক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সেই বরযাত্রকে বিশেষরূপে অপমানিত করিলেন। তাহাতে সমস্ত বরযাত্র একত্র হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহারা রামেশ্বর বাবুর বাটীতে আর জল গ্রহণ করিবেনা এবং বরকর্ত্তা যদি তথায় তাঁহার পুত্রের বিবাহ দেন তাহা হইলে তাঁহার সহিতও আহার-ব্যবহার ত্যাগ করিবেন। রামেশ্বর-বাবু ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের বর-কর্ত্তাকে পর্য্যন্ত বিলক্ষণ কটূক্তি করিলেন। তখন সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া সে বাটী পরিত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে বরের জন্য একটী পাত্রীও মিলিল। পাত্রী রূপে গুণে রামেশ্বর-বাবুর পৌত্রী অপেক্ষা ন্যূন নহে। সুতরাং বরের বিবাহ হইল; কিন্তু কন্যার কি হইবে?

[১০]

যখন সকলে চলিয়া গেল তখন রামেশ্বর-বাবুর সংজ্ঞা হইল। প্রথমে তিনি ভাবিলেন পাত্রী অভাবে তাহারা নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। তজ্জন্য তিনি প্রথমে কোন পাত্রের চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু পরিশেষে যখন শুনি-লেন যে বরের পাত্রী মিলিয়াছে এবং বিবাহ আরম্ভ হই-য়াছে তখন তিনি চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিলেন। শীঘ্র একটি পাত্রের জন্য চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও পাত্র মিলিল না। কারণ সকলেই তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ, সুতরাং তিনি হতাশ হইয়া কাঁদিতে বসিলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন যে ইহা তাঁহার পূর্ব্বকৃত পাপের ফল। তিনি তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করিতেছেন ও জাতি-চ্যুত হইবার ভয়ে এক অশীতিপর বৃদ্ধের হস্তে প্রাণসমা পৌত্রীকে সমর্পণ করিবার কল্পনা করিতেছেন এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে কে বলিল, —"রামেশ্বর ভায়া গাত্রোত্থান কর।" রামেশ্বর ফিরিয়া দেখিলেন, রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। দেখিয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিয়া রত্নেশ্বর-বাবুর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। দর্পীর দর্প চূর্ণ হইল! মহানুভব চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় তাঁহাকে দুই হস্তে উঠাইয়া কহিলেন,—"ভায়া! ভাবনা কি? আমার পৌত্রের সহিত তোমার পৌত্রীর বিবাহ দাও। দেখ আমার পৌত্র কোন অংশে তোমার পৌত্রীর অযোগ্য

নহে।” রত্নেশ্বর-বাবুর কথা শুনিয়া রামেশ্বরের হৃদয় দারুন অনুশোচনায় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—“ভাই রত্নেশ্বর! আমি তোমার জাতিনাশের উদ্যোগ করিয়াছিলাম বলিয়াই কি তুমি আমার জাতিরক্ষা করিলে? হায়! একি রকম প্রতিশোধ লওয়া?” এ দিকে বিবাহ আরম্ভ হইল। দুই বৃদ্ধে উভয়ের অতীতের কত কথা হইল। রামেশ্বর-বাবু স্বীকার করিলেন তিনি শান্তিকে পুত্রবধু করিবার জন্যই সেই জালচিটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রত্নেশ্বর-বাবু কিরূপে তথায় আসিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া কহিলেন—“যখন দেখিলাম সকলেই তোমার বিপক্ষ এবং যথার্থই পাত্রাভাবে তোমার জাতিনষ্ট হয় তখন আর থাকিতে পারিলাম না। আমার পৌত্র আমার সঙ্গেই ছিল, ইহাকে উপলক্ষ করিয়া পুরাতন মনোমালিন্য দূর করিবার ইচ্ছায় আমি সেচ্ছায় আমার পৌত্রকে তোমায় দিলাম।” রামেশ্বর অশ্রুপূর্ণনেত্রে কতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। দুই বন্ধু পুনর্ব্বার মিলিত হইলেন।

আষাঢ়—১৩০৫। শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মা আমার।

১

দুঃখ-ভরা সংসারেতে আসিল গো কোথা হ'তে
স্বরগের সুধামাখা 'মা' নাম সুন্দর,
তুলনা করিতে যার মিলেনা কোথাও আর
মধুর দ্বিতীয় বাক্য ধরার ভিতর ?

২

সুখময় শিশুকালে মধুর 'মা' নাম বলে,
প্রথমে যখন শিশু শিখে উচ্চারিতে ;
সেই নাম স্নেহ-মাখা হৃদয়েতে থাকে লেখা,
মুছে না'ক কোন কালে অন্তর হইতে।

৩

ত্যজি গর্ভ-কারাগার এই ভব-কারাগার
প্রবেশিতে হ'ল বলে' কাঁদিনু যখন,
শক্তি নাহি হ'ত পায় অবশ তখন কায়
মাতৃ স্নেহে ছিনু শুধু জীবিত তখন।

৪

কখনও কোন কালে সন্তান পীড়িত হ'লে
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা জননী তখন,
পুত্রের শিয়রে বসি' সেবেন দিবস নিশি,
মূর্ত্তিমতী দয়া প্রায়, করিয়া যতন।

৫

মায়ের স্নেহের বুকে থাকে শিশু যত সুখে,
যে আনন্দ ভুঞ্জে মাতৃ-অঙ্কেতে শুইয়া,
কভু তাহা নাহি পায় যদিও দাওগো তায়
নন্দন-কুসুম-বৃন্দে শয়ন রচিয়া।

৬

পুত্রসনে সমসুখী পুত্রসনে সমদুখী
মাতা বিনা এ জগতে কেবা আছে বল ?
সকলই স্বার্থ পূর্ণ মাতৃস্নেহ স্বার্থশূন্য
নিঃস্বার্থ প্রীতির এই দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল।

৭

যৌবনে মোহের ঘোরে কুপুত্রের অত্যাচারে
সহেন কতই ক্লেশ, বহে অশ্রুধার,
মুছেন তখনি তায় সদা মনে এই ভয়
পাছে অকল্যাণ হয় তনয়ের তাঁর।

৮

নিজাপেক্ষা অন্য জনে ভাগ্যবতী মানে ধনে
হেরিলে উপজে মনে বিদ্বেষের ভাব ;
পুত্রে ধনী মানী হেরে, হৃদয় পুলকে পূরে,
স্নেহের আশ্চর্য্য কিবা মধুময় ভাব !

৯

প্রত্যক্ষ দেবি-রূপিণী জননী স্নেহের খনি
কলুষ পঙ্কিল এই অবনী-মাঝেতে ;

যাবৎ জীবন রবে তত কাল একভাবে
ভক্তি ভরে নমি যেন তাঁর চরণেতে।

পৌষ—১৩০৪। শ্রীঅধর কৃষ্ণ বসু।

প্রার্থনার ক্ষমতা।

'ঈশ্বর কি' তাহা আমরা জানিনা বা বুঝিনা—তিনি আমাদের মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিনা বটে, কিন্তু তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের কথা বলিতে পারি,—নির্জ্জনে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া একাগ্রমনে তাঁহার নিকট অভাব জানাইয়া প্রতিকারপ্রার্থী হইতে পারি।

'ঈশ্বর কি' তাহা আমাদের জানিবার আবশ্যক নাই—জানিয়া কি হইবে? বরঞ্চ আমরা যদি তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ রাখিতে পারি তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইবেন।

অনেকে বলিতে পারেন যে 'ঈশ্বর কি' তাই যদি জানিতে নাই পারিলাম তবে কাহার নিকট হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিব——কে আমাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাদের দুঃখ দূর করিবেন?

বেশ, একথা আপনারা বলিতে পারেন; কিন্তু সাধা-

রণতঃ, আপনারা এটুকুও কি জানেন না যে, এই পরিদৃশ্য-মান ভূমণ্ডল ও এতন্নিবাসী প্রাণীগণের একজন স্রষ্টা আছেন—যিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্ব-গুণাধার এবং যিনি প্রাণীসমূহের বৃত্তি-নিচয়ের স্রষ্টা ও তাহাদের অভাব পূরণ ও দুঃখ বিমোচনক্ষম? তাহা যদি জানেন তাহা হইলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠার্থে আপনাদের তদধিক জ্ঞানের কিছুই আবশ্যক নাই।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া আমার দায় হইতে খালাস হওয়া ভাল। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা উক্ত গুণ-সমূহ না স্বীকার করেন তাঁহারা এই খানেই 'ইতি' করুন। আমি কাহারও সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা উল্লিখিত ঐশ্বরিক গুণসমূহের সত্যতা প্রমাণ করিব, সে ক্ষমতা আমার নাই—আমার কেন, কাহারও নাই। যে মহা ঋষিরা মহাজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন—যাঁহারা জীবনের সমুদয় কাল জ্ঞানার্জ্জনে অতিবাহিত করিয়াছেন—যাঁহারা জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু-সাহায্যে প্রকৃতির যত্র-তত্র ঈশ্বর দেখিতেন—যাঁহারা বায়ুর নিঃস্বনে ঈশ্বরের বাক্য শুনিতেন—তাঁহারই বলিয়া গিয়াছেন,—'তর্কদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইওনা।' একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি মনুষ্যবুদ্ধির অতীত; সুতরাং সামান্য তর্কে তুমি তাহার কি প্রমাণ করিবে?

যাহা হউক, যাঁহারা ঈশ্বরকে স্রষ্টা ও সুখ-দুঃখ-দাতা

বলিয়া ভাবেন তাঁহারাই যেন ইহা পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত আর কাহারও পাঠ করিবার আবশ্যক নাই—যেহেতু যাঁহাদের মূলেই অবিশ্বাস তাঁহারা কিসের উপর ভিত্তি তুলিবেন ?

কি বলিতেছিলাম—প্রার্থনাদ্বারা আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি এবং প্রার্থনাবলেই ঈশ্বর মানবের প্রত্যক্ষীভূত হয়েন। প্রার্থনা কাহাকে বলি, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না ; প্রাণের আবেগে—হৃদয়ের কপাট খুলিয়া যাহা আমরা তাঁহাকে জানাই তাহাকেই প্রার্থনা বলিয়া থাকি।

এখন এই প্রার্থনার ক্ষমতা কতদূর তাহাই অদ্য পাঠককে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

স্কটলণ্ডে কোয়েরিয়ার নামক জনৈক ব্যক্তি পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকদিগের বন্ধু ও জনক সদৃশ ছিলেন। তিনি তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্কটলণ্ডে অনাথাশ্রমের অভাব নাই ; তত্রাচ তিনি সে কার্য্যে যে অগ্রসর হইলেন তাহার কারণ আছে—তিনি এমন একটি আশ্রম চাহেন যথায় অভাগা পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকগণ বাটির (Home) ন্যায় থাকিতে পারে—অর্থাৎ পিতা মাতার নিকট তাহারা যেরূপ যত্ন আদর পাইত এই আশ্রমেও যেন সেইরূপ পায়।

যদিও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু বটে কিন্তু তিনি ইহার

প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ কোথায় পাইবেন? তিনি স্বয়ং ধনী নহেন যে ইচ্ছামাত্রেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন; যাহা হউক তিনি কি প্রকারে এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিলেন শুনুন।

তিনি নিজে বলেন যে এই কার্য্যে সফলতা লাভের জন্য তিনি একাগ্রমনে পঞ্চবিংশ বৎসর ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি যুবাকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "যদ্যপি ভগবান আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেন তাহা হইলে আমি এই কার্য্য নিশ্চয়ই করিব।" তিনি ক্রমাগত সাত বৎসর রাস্তায় নিরাশ্রয় বালকগণের সহিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি কোনও কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেই আয়ে তাঁহাকে একটি পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। কিন্তু তিনি এখনও তাঁহার যৌবনের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়েন নাই। তিন মাস অনবরত তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে কি প্রকারে তিনি এই প্রকার কার্য্যে সফলকাম হইবেন তাহার উপায় দেখাইয়া দিন—এবং অবশেষে তিনি প্রার্থনা কালে ঈশ্বরকে জানাইলেন যে ২০০০ পাউণ্ড হইলে তিনি এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। এ বিষয় কেহই জানিত না—এই কথা তাঁহাতে ও ঈশ্বরেতে হইয়াছিল এবং তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে এই অর্থ একেবারে চাই নচেৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবেনা।

কি আশ্চর্য্য! ইহার ত্রয়োদশ দিবস পরে লণ্ডনস্থিত একটি বন্ধু সংবাদপত্রে তাঁহার উদ্দেশ্য পাঠ করিয়া একেবারে দুই হাজার পাউণ্ড উক্ত কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য পাঠাইলেন।

এই অর্থ প্রাপ্ত হইয়া বেনফ্লু লেনে তিনি একটি কারখানা বাটি ভাড়া লইয়া তাঁহার বহুকালেপ্সিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

একদিবস দুইটি বালক আনীত হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পোষাকাদি প্রদত্ত হইল; কিন্তু এক জনের একটি জ্যাকেটের অভাব হইল। জ্যাকেটের অভাব দেখিয়া পরিচারিকা কহিল,—"আসুন, আমরা প্রার্থনা করি।' তাহার কথানুসারে ঈশ্বরের নিকট তাহাদের উপস্থিত অভাব জ্ঞাপন করা হইল।

আহা কি আশ্চর্য্য! সেই রাত্রেই সেই বালকের গাত্রোপযোগী একটি জ্যাকেট ডম্বারটন নাম স্থান হইতে ডাকবাঙ্গীতে আসিয়া পঁহুছিল। পাঠক কি বলেন—প্রার্থনার কি অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি নাই? এ সমুদয় কথা আমার স্বকপোলকল্পিত কথা নহে—ইহা স্বয়ং কোয়েরিয়ার সাহেবের কথা।

পাঠক! আপনাকে কোয়েরিয়ার সাহেবের আর একটি কথা শুনাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বে যে কারখানা-বাটির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে

সেটিতে ত্রিশটির অধিক বালকের স্থান ছিল না সুতরাং কিছু দিন পরে তাঁহাদিগকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইল। এবারে তাঁহারা 'কেস্‌নফ্‌ হাউসে' উঠিয়া গেলেন এবাটিতে এক শত বালকের উপযুক্ত ঘর ছিল।

এই বাটিতে অবস্থান-কালে (১৮৭২ খৃঃ অঃ) ষাটটি বালক কেনাডা যাইবার উপযুক্ত হইয়াছিল—ইহাদিগকে কেনাডায় পাঠাইতে ছয় শত পাউণ্ড খরচ—কিন্তু তখন তহ্‌-বিলে পাঁচশত ত্রিশ পাউণ্ডের অধিক নাই। কি হয়—উপায়ন্তর নাই—সুতরাং তাঁহারা সেই মঙ্গলময়ের নিকট তাঁহাদের অভাব জানাইলেন এবং যথা সময়ে তাঁহারা চারি জন ব্যক্তির নিকট হইতে অযাচিত দান পাইলেন। এক জন পঞ্চাশ, এক জন দশ এবং অপর দুই জন পাঁচ, পাঁচ, দশ পাউণ্ড দান করিলেন—এই সত্তর পাউণ্ড প্রাপ্ত হইয়া—তাঁহাদের তৎকালীন অর্থাভাব পূরণ হইল।

পাঠক! কি বলেন! আসুন, আমরাও সকলে তাঁহার নিকটে মনোবেদনা ও অভাব সরলান্তঃকরণে জ্ঞাপন করি—তিনি আমাদের আশা পূরণ করিবেন।

বৈশাখ ১৩০৫। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপধ্যায়।

প্রার্থনা।

সখে! আসি ধরা'পরে ঘোর মোহজ্বরে
হয়েছি নয়ন-হীন।
এবে না বাছিয়া পথ যথা মনোরথ
চলেছি আতুর, দীন॥
করি সুধীরে গমন টিপিয়া চরণ
সতত শঙ্কিত চিতে;—
পাছে, হই নিমগন ক্লেদময় কোন
গভীর গহ্বর-ভিতে!
হেথা পুছিব কাহারে সুপথ, আহারে!
সকলেই মোরা অন্ধ!
হায়! সকলেই ফিরি' ঢুঁড়ি দিব গিরি
মনেতে লইয়া ধন্দ!!
অহো! সকলেরই চিত হয়েছে দূষিত
কূপের কলুষ মাখি'।
হের সবে ভগ্নকায় পড়িয়া হেথায়,
সবারি সজল আঁখি॥
যত সোজা পথধরি' চলি অগ্রসরি
তত হই কূপে মগ্ন:
তত ভাঙ্গে পদ, হাত, ভাঙ্গে মুখ, মাথ,
হয়ে যায় হৃদি ভগ্ন!

সখে! হেরিয়া সবার এ দুখ অপার
কাঁদে নাকি তব প্রাণ?
ইচ্ছা হয় নাকি তব করিতে এ সব
দুখ তা'র অবসান!
হায় জান নাকি সখে! বিকল এ চোখে
স্বরগের পথ চিনে'
আর পারিবনা যেতে কভু স্বরগেতে
তব সহায়তা বিনে?
তবে এখনো নীরব কি হেতু হে ভব!
দেখাও দেখাও পথ।
বঁধু! এস ত্বরা করে; আর মোহ-ঘোরে
ঘুরিলে হইব হত॥

২০শে মে ১৮৯৮।

সমাপ্ত।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

নিম্নলিখিত পাঠকগণের সম্পূর্ণ সাহায্যে "প্রতিধ্বনি" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল:—

১। শ্রীযুক্ত বাবু যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। " " সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। " " সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। " " বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য।
৫। " " যোগেন্দ্রনাথ বসু।
৬। " " নরেন্দ্রচন্দ্র বসু।
৭। " " প্রবোধচন্দ্র বসু।
৮। " " জীবনকৃষ্ণ বসু।
৯। " " সুরেন্দ্রনাথ বসু।
১০। " " ননীলাল বসাক।
১১। " " প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১২। " " ললিতলোচন দত্ত।
১৩। " " যতীশচন্দ্র দত্ত।
১৪। " " উপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৫। " " ভৈরবচন্দ্র ঘোষাল।
১৬। " " রাসবিহারী ঘোষ।

১৭। " " সুশীলকুমার ঘোষ।
১৮। " " গগনচন্দ্র মিত্র।
১৯। " " নরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।
২০। " " যতীশচন্দ্র মিত্র।
২১। " " নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
২২। " " তারাভূষণ পাল।
২৩। " " শশধর প্রামাণিক।
২৪। " " অসীমকৃষ্ণ সরকার।
২৫। " " নন্দকিশোর ত্রিপাঠী।